স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী।

ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

রামতনু লাহিড়ী

সিটী বুক সোসাইটী
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার

মূল্য ।৵৹ আনা।

ভারত-গৌরব-গ্রন্থাবলী

(প্রকাশিত হইয়াছে)

রামমোহন রায়

বিদ্যাসাগর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মহামতি রাণাডে

বঙ্কিমচন্দ্র

দয়ানন্দ সরস্বতি

রামতনু লাহিড়ী

(প্রস্তুত হইতেছে)

প্রতাপসিংহ

বুদ্ধদেব

অশোক

গুরুগোবিন্দ ইত্যাদি

কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাকা প্রেসে,
শেখ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের পুণ্য-কাহিনী প্রকাশিত হইল। তাঁহার জীবনে কর্ম্মবৈচিত্র্য বা ঘটনা-বাহুল্য ছিল না। অথচ তাঁহার জীবন আদর্শস্থানীয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি চিরদিন আপনার বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম্ম এবং সত্যের পথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাস্তিকতা এবং কপটতা তিনি একবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। বহুনিগ্রহ এবং নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও তিনি নাস্তিকতা এবং কপটতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন নীতি, এবং ধর্ম্মে কোন প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি হয় না। এই বিশ্বাসের পরিচয় তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় স্পষ্ট দেখা যায়।

আমরা সকল ব্যাপারে একটা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে ইচ্ছা করি। এই আকাঙ্ক্ষা এখন বড়ই প্রবল। ইহার ফলে, আমরা এখন না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীষ্টান। ধর্ম্মেত গেল এই। সমাজে, আচারে, ব্যবহারেও তথৈবচ। আমরা ইহা বুঝি না যে, নীতি এবং ধর্ম্মের ভিতরে "আপোষ" 'compromise' চলে না। ইহাতে আদর্শ মলিন এবং খর্ব্ব হয়। আদর্শের অনুরূপ হইবার চেষ্টা শিথিল এবং হ্রাস হয়। ইহাতে ধর্ম্ম এবং সমাজের অমঙ্গল হয়।

এই অমঙ্গল দূর করা উচিত। এই জন্য সত্যপরায়ণ সাধু লোকের আবশ্যক। তাঁহাদের জীবনের উজ্জ্বল মহান্ আদর্শ আবশ্যক। সত্যনিষ্ঠ সাধু রামতনুর জীবনে আমরা সেই উজ্জ্বল মহান্ আদর্শ দেখিতে পাই। সেই উজ্জ্বল মহান্ আদর্শ যুবক-সমাজের সম্মুখে রাখিবার জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত এবং প্রচারিত হইল। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, যেন গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল হয়।

এই গ্রন্থখানি পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী-বিবৃত ঘটনা অবলম্বনে লেখা হইয়াছে। এই জন্য এখানে ভক্তিভাবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি

আরা
১৮ই বৈশাখ, ১৩১৮
অক্ষয়াতৃতীয়া

গ্রন্থকার।

রামতনু লাহিড়ী।

বংশ-পরিচয়।

রামকিঙ্কর।—দেখ গোবিন্দ, রোজ রোজ আর খিচ্ খিচ্ ঝিক্ ঝিক্, ঝগড়া গণ্ডগোল ভাল লাগে না। মেয়েদের ঝগড়ার জন্ত বাড়ীতে কাক্ চিল বসিবার যো নাই। পাড়ায় কান পাতিতে পারা যায় না। দেশে থাকা ক্রমে ভার হয়ে উঠিল।

রামগোবিন্দ।—দাদা, আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব। মেয়েদের মধ্যে, শাশুড়ী-বউয়ে, জায়ে জায়ে, ননদে ভাজে, কোন্ বাড়ীতে কলহ বিবাদ, ঝগড়া বচসা না হয়? একসঙ্গে দশটা হাঁড়ি কলসী থাকিলেও ঠোকাঠুকি হয়; তা, এতবড় পরিবারে, এতগুলা স্ত্রীলোক থাকিলে কোন্দল হওয়া আশ্চর্য্য কি? এ রকম হয়েই থাকে। তবে ঐ সব কথাতে পুরুষদের কান-ভারি করান, আর পুরুষদের সেই সব কথা লইয়া মনান্তর হওয়াটা ঠিক নহে। ভাইয়ে ভাইয়ে, মনান্তর হওয়ার চেয়ে, মানে মানে সদ্ভাবে পৃথক হওয়াই ভাল।

রামকিঙ্কর।—আমিও সেই কথা বলিতেছি। দেখ, আমার না ছেলে, না পুলে। অসময়ে যে কেহ দেখিবে, এমন কেহ নাই। আমি না হয় যতদিন রোজগার করিব, ততদিন কোন ভাবনা নাই। তার পর আমার অবর্ত্তমানে আমার বিধবা স্ত্রী—তার দশা কি হইবে? তাহার পেটের না ছেলে না মেয়ে আছে, যে তাহাকে দেখ্‌বে। কাজেই তাঁহার জন্য কিছু রাখা ত উচিত। এতবড় পরিবার কুপোষ্যতে ভরা। ইহাদের জন্য আমি আর আমার সমস্ত টাকা খরচ করিতে পারি না। তাও না হয় পারি, আর এতদিন ত আমিই সমস্ত খরচ চালাইতে ছিলাম, কিন্তু তার আর যো নাই। কাহারো পান হইতে চূণ খসিলেই রাগ অভিমান, শেষে ঝগড়া বচসা। আর সহ্য হয় না। তুমি যে বলিতে-ছিলে মানে মানে সদ্ভাবে পৃথক হওয়া ভাল, আমিও তাই বলি।

রামগোবিন্দ।—বেশ তাঁহি হউক। আপনি যেমন ব্যবস্থা করিবেন, তাই আমার শিরোধার্য্য। আপনি জ্যেষ্ঠ অগ্রজ— পিতৃতুল্য। আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

রামকিঙ্কর।—আমি জানি তোমার কিছুতেই আপত্তি নাই। আর তুমি বুদ্ধিমান, ছেলেবেলা হইতেই ধর্ম্মভীরু। কাহারও এক পয়সা অন্যায় করে লও নাই। তা, আমি বলি-তেছিলাম কি—তুমি ত সব জান—এ সমস্ত বিষয় সম্পত্তি

আমার স্বোপার্জ্জিত। আমাদের পৈতৃক এবং দেবোত্তর সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা আমি চাই না—সে সমস্তই তোমার থাকুক; কেবল দেবসেবা আর পরিবার প্রতিপালনের ভারটি তুমি লও। আমি সন্তুষ্ট হইয়াই বলিতেছি, পৈতৃক সম্পত্তি বা দেবোত্তরের এক পয়সাও আমি চাই না।

রামগোবিন্দ পৈতৃক সম্পত্তির এবং দেবোত্তর সম্পত্তির যত আয়, তাহা বেশ জানিতেন। তাহা হইতে এই বৃহৎ পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান অতি কষ্টে হইত। রামকিঙ্কর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান মুন্সী। তিনি কৃতী পুরুষ উপায়ক্ষম, তাঁহার পয়সাতে বার মাসে তের পার্ব্বণ, দোল দুর্গোৎসব, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, কুটুম্ব কুটুম্বিতার সকল খরচ চলিত। তিনি অপুত্রক হইলেও এ সমস্ত খরচ চালাইতেন। আর তখনকার সমাজে এরূপ না করিলে নিন্দা হইত। যাহা হউক এতদিন এইরূপ ভাবেই চলিতেছিল—পরে, যাহা ঘটিল, তাহা উপরে বর্ণিত হইল। রামগোবিন্দ অগ্রজ রামকিঙ্করের মতেই মত দিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "দাদা, শালগ্রামটি কি কুপোষ্য?" যাহা হউক তিনি শেষে বলিলেন, "দাদা, আপনি তবে সমস্ত ঠিক্ করিয়া দিন্। কাল হইতে পৃথক্ পাকের ব্যবস্থা হইবে।"

ভাই ভাই এই ভাবে ঠাঁই ঠাঁই হইলেন। রামগোবিন্দের বহু পোষ্য। তাঁহার পাঁচটি পুত্র সন্তান। ইঁহাদের মধ্যে মধ্যমটি কৃতী। তাঁহার নাম কাশীকান্ত। কাশীকান্ত

দিনাজপুরের রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। রামগোবিন্দের পৈতৃক এবং দেবোত্তর জমাজমির এবং কাশীকান্তের চাকুরীর আয়ে কোন রকমে সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল।

কাশীকান্তের দুই বিবাহ। দুই স্ত্রীর গর্ভে দুইটি সন্তান হয়। জ্যেষ্ঠের নাম ঠাকুরদাস লাহিড়ী। ইনি উত্তর কালে "লাহিড়ী দেওয়ান" নামে পরিচিত। ঠাকুরদাস রাজা গিরিশচন্দ্রের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় থাকিতে হইত।

কাশীকান্তের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ লাহিড়ী। রামকৃষ্ণের বিষয় বুদ্ধি তত প্রবল ছিল না। তিনি পিতামহ রামগোবিন্দের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। অধিকাংশ সময় ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া থাকিতেন। ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও তিনি গৃহী ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বারুইহুদা গ্রামনিবাসী দেওয়ান রাধাকান্ত রায়ের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীর সহিত রামকৃষ্ণের বিবাহ হয়। জগদ্ধাত্রী দেবী অতি গুণবতী মহিলা ছিলেন। তাঁহার কথা মনে হইলে, গিরিরাজ-দক্ষ-কন্যা সতীর কথা মনে আসে। সতী রাজকন্যা হইয়াও ভিখারী শঙ্করের ঘরই পছন্দ করিয়াছিলেন। পিতার গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ-বিলাসে বাস করা অপেক্ষা দরিদ্র পতি-গৃহে দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে, অভাব অনটনের কষ্ট সহ্য করা সাধ্বী পত্নীর পক্ষে গৌরবজনক এবং সম্মান-

কর। স্বামী দরিদ্র হইলেও স্ত্রী নিজ গৃহে, স্বামীর সোহাগে, প্রফুল্ল থাকেন, পতির পদসেবা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করেন। পিতৃগৃহ ধনরত্নে পূর্ণ হইলেও—পিত্রালয় অশেষ সুখের আলয় হইলেও, পতিপরায়ণা পত্নী দরিদ্র স্বামীর গৃহ ছাড়িয়া সেখানে বাস করিতে চাহেন না। সতীর সখী জয়ার উপদেশ প্রত্যেক রমণীর স্মরণ রাখা উচিত। জয়া বলিয়াছিলেন :—

দেখিয়া কাঙ্গালি, সবে দিবে গালি,
রহিতে না দিবে নাছে।
জননীর আশে, যাবে পিতৃবাসে,
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে,
যদি দেখে লক্ষীছাড়া॥

জগদ্ধাত্রীর পিতা রাধাকান্ত রায় কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর দেওয়ান। জগদ্ধাত্রী তাঁহার একমাত্র কন্যা। সুতরাং সহজেই বুঝা যায় তিনি কত আদরের মেয়ে। রাধাকান্ত চেষ্টা করিলে হয় ত রামকৃষ্ণকে ঘরজামাই করিয়া রাখিতে পারিতেন। কুলীনদিগের মধ্যে, ঘরজামাই হইয়া থাকা, অথবা ঘরজামাই করিয়া রাখা, জামাতা বা শ্বশুরের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু যাঁহার জন্য এ ব্যবস্থা তাঁহার ঐ বিষয়ে আগ্রহ ছিল না। জগদ্ধাত্রী স্বামীগৃহে বাস করাই সম্মানজনক মনে করিয়াছিলেন, এবং তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণের

কদমতলার বাড়ীতে আসিলেন। রামকৃষ্ণের অবস্থা স্বচ্ছন্দ নয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পৈতৃক এবং দেবোত্তরের জমাজমির সামান্য আয় এবং নিজের চাকুরীর সামান্য বেতনে তিনি সংসার চালাইতে লাগিলেন। অভাব অনটন যথেষ্টই ছিল। কিন্তু গুণবতী ভার্য্যার জন্য তাহাতে তিনি কষ্ট বোধ করিতেন না। অভাবেও তাঁহাদের সন্তোষ ছিল। বাস্তবিক জগদ্ধাত্রী দেবীর গৃহিণীপনা দেখিয়া কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে :—

অনির্ব্বাদে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥

জগদ্ধাত্রী পিতৃগৃহে কত সুখে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সেখানে দাসদাসীর অভাব ছিল না, অন্ন-বস্ত্রের অভাব ছিল না, সেখানে তাঁহাকে নিজহস্তে কোন কর্ম্ম করিতে হইত না—বরং স্বহস্তে অনেককে অন্ন বস্ত্র দান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিতৃগৃহে ভোগ-বিলাসের অভাব ছিল না। কিন্তু জগদ্ধাত্রীদেবী এত সুখ-সম্পদের মধ্যে লালিত পালিত হইলেও, তাঁহার মধুর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি স্বভাবতঃ কর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। পতিগৃহে তিনি প্রায় সকল কাজই নিজ হাতে করিতেন। ঘর নিকান, জল আনা, বাসন মাজা, ধান ভানা, পাক, পরিবেশন, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, পূজার আয়োজন, সন্তান পালন, কিছুতেই তাঁহার বিরক্তি দেখা যাইত না। কেহ তাঁহার বিরস বদন

দেখিতে পাইতেন না। মুখে হাসিটুকু যেন সদাই লাগিয়া আছে। তিনি স্বামীর গৃহের এত কাজ করিতেন, এতই দারিদ্র্যের মধ্যেই থাকিতেন, কিন্তু যদি কেহ তাঁহার দুঃখ কষ্টের জন্য ইসারা ইঙ্গিত করিয়া, 'আহা' করিত, তবে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি এরূপ 'আহা মরি' করা আর তাঁহাদের দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করা একই মনে করিতেন। তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান এমনই ছিল। কুটুম্বসমাজে প্রতিবেশিগণের মধ্যে, ধর্ম্মপথে থাকিয়া, অভাব অসচ্ছলতা বা দারিদ্র্যের ক্লেশ ভোগ করা যে অপমান-জনক নহে—এ কথা কয়জন লোক বুঝেন? এমন অবস্থায় পড়িয়া কয়জন অপরের ধনজনিত তাচ্ছল্য অথবা তথাকথিত সহানুভূতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন? ধনবত্তা বা দারিদ্র্য এ দুইটাই মানুষের জীবনের শৈশব যৌবন বার্দ্ধক্যের মত-নদীর জোয়ার ভাটার মত একটা অবস্থা বিশেষ, তাহা কয়-জন বুঝেন? জগদ্ধাত্রী দেবী স্ত্রীলোক হইয়া যে তাহা বুঝি-তেন, ইহ কম প্রশংসার কথা নহে। জগদ্ধাত্রী দেবীর আমরা ইহার মধ্যে যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে জানা গিয়াছে তিনি যে কেবল একজন ধার্ম্মিকা, দেব-ভক্তিপরায়ণা, সতী নারী ছিলেন এমন নয়, তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতীও ছিলেন। আমরা-অনেক সময় শুনিতে পাই, মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়া, বাপের বাড়ীর মত আদর যত্ন না পাইলে, অথবা সেখানে সামান্য কষ্ট হইলে, পত্রের দ্বারা হউক অথবা পরিচারিকা বা আত্মীয়

লোকের সাহায্যে হউক তাঁহাদের কষ্টের কথা পিতা-মাতাকে জানাইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলেন। অনেক সময় ইহা লইয়া উভয় পরিবারে অনেক কলহ বিবাদ এবং অশান্তি হয়। জগদ্ধাত্রী দেবী এই প্রকৃতির রমণী ছিলেন না। একদিন, জগদ্ধাত্রী শ্বশুরবাড়ীতে ধান ভানিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বাপের বাড়ীর একজন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া উপস্থিত হয়। দেওয়ানজীর বাড়ীর দাসী, দেওয়ানজীর আদরের মেয়ের সেই অবস্থা দেখিয়া কত যে কি বলিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জগদ্ধাত্রী তাহাতে কান দিলেন না। দাসীকে স্নানাহার করাইয়া শেষে তাহার যাইবার সময় বলিয়া দিলেন—"মাকে বলিও আমি এখানে বেশ আছি, আমার কোন দুঃখ নাই। আমি কাজ করিতে বড় ভাল বাসি।" আশা করি আমাদের স্নেহময়ী কন্যাগণ জগদ্ধাত্রী দেবীর এই আচরণ হইতে বিশেষ উপদেশ পাইবেন।

রামকৃষ্ণ যেরূপ সাধুপ্রকৃতির লোক, ভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ভার্য্যাও দিয়াছিলেন। মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল। এই ভাগ্যবান দম্পতী সত্যব্রত সাধু রামতনু লাহিড়ীর জনক জননী।

জন্ম এবং শৈশব।

কন্যা নিজগুণে শ্বশুরবাড়ীর এবং বাপের বাড়ীর আদরের সামগ্রী হয়েন। তাঁহার কথা এবং আচরণের দোষ-গুণে শ্বশুর-শাশুড়ী, বাপমায়ের রুষ্টি তুষ্টি হয়। জগদ্ধাত্রীদেবীর আচরণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি লক্ষ্মী বউ, এবং আদরের মেয়ে ছিলেন। হিন্দু গৃহস্থের বউঝিরা যেমন সময় এবং আবশ্যকমত শ্বশুরবাড়ী এবং বাপের বাড়ী দুই স্থানেই থাকেন,উৎসব পর্ব্বে যাওয়া আসা করেন, তখনকার দিনেও এইরূপ চলিত। এখনও প্রসবের সময় অনেক মহিলা পিতৃগৃহে আসেন। এবং শিশু একটু বড় হইলে, তিন মাসের বা ছয় মাসের হইলে, (অনেক সময় ছয় মাসের হইলে)—শিশুর অন্নপ্রাশনের সময়, পতিগৃহে যান, তখনকারদিনেও এ প্রথা খুবই প্রচলিত ছিল। তখন সূতিকাগারের যেরূপ বর্ণনা ও তাহার মধ্যে প্রসূতির শয়ন এবং আহারের যেরূপ ব্যবস্থার কথা শুনা যায়, এবং সকলের উপর বধূর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে শ্বশুর শাশুড়ী জা, ননদ, দেবর ভাসুরের যেরূপ একটা ধারণা ছিল, তাহাতে বধূর পিতৃগৃহে গিয়া পিতামহী মাতা জেঠি খুড়ী পিসিমার নিকটে থাকিয়া সূতিকাগারে বাসই প্রশস্ত ছিল। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে পূর্ব্বকালের সূতিকাগারের

ব্যবস্থা আছে। বাটীর প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে একটি তাল-পাতার কুটীরে আঁতুড় হইত। অথবা বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ঘরটি উহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। সূতিকা-গৃহের একমাস-কাল-ব্যাপী অগ্নির জন্য গৃহস্থ পূর্ব্ব হইতেই একটি সুবিশাল আম্রের বৃক্ষ কাটিয়া কাঠ করিয়া বসিতেন। শুঁঠ পিপুল প্রভৃতি মসলা যোগে ঝাল তৈয়ারি হইত। শিশুর জন্য "আলুই" তৈয়ারি হইত। সর্ষপ তৈল অজস্র খরচ হইত। এখনকার নগরবাসিনী কন্যা বা বধূগণ এ সব কষ্টের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন। তখন, ফ্লানেল, সাবান, চা, বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রচলিত ছিল না।

জগদ্ধাত্রী দেবীর অনেকগুলি ছেলে পিত্রালয়ে জন্মে। এবার তিনি পিত্রালয় রারুইহুদায় আসিয়াছেন। ভাদ্রমাস শেষ হয় হয়। আর একমাস, পরে বাঙ্গালীর উৎসবের দিন আসিবে। দেশের নদনদী কাণায় কাণায় ভরা। খালে বিলে কত কুমুদ-কহ্লার ফুটিয়াছে। প্রান্তর ভূমি শস্যশ্যামলা হইয়াছে।

রৌদ্রের আর সে প্রখর তেজ নাই। চারিদিকে লোকের মুখে, প্রকৃতিতে একটা আশা ও প্রফুল্লতার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। জগদ্ধাত্রী দেবীও আশান্বিত হৃদয়ে দিন গণিতে-ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা আত্মীয়স্বজনও আশায় ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছিলেন। উৎকণ্ঠার দিন কাটিল। ২৪শে ভাদ্র সোমবার জগদ্ধাত্রী দেবী রাত্রি ৯টার সময় একটি

সন্তান প্রসব করিলেন। ধাত্রী চীৎকার করিয়া বলিল, "খোকা হইয়াছে।" চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল. বাটীর নব্যা বধূগণ সজোরে শঙ্খধ্বনি করিলেন, বয়স্থারা হুলু-ধ্বনি দিলেন। পাড়ায় প্রচার হইল, দেওয়ানজীর 'একটি দৌহিত্র হইয়াছে।' বড় লোকের বাড়ী। ঢুলী বাজনদার সুসংবাদ শুনিয়া যথাসময়ে উপস্থিত হইল। আনন্দ-বাদ্য বাজিতে লাগিল—বাদ্যের অপেক্ষা উচ্চস্বরে বক্সিসের প্রার্থনা হইল। বাড়ীর ছেলে বাবুদিগকে, ভাগিনেয় হইয়াছে বলিয়া বাজনদার, দাস দাসী, ধোপা, নাপিত বকসি-সের জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরামাণিক সুসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনগর গেল। এবার জগদ্ধাত্রী দেবীর নির্ব্বিঘ্নে পুত্র হওয়াতে একটু বেশী আহ্লাদের কারণ যে না ছিল এমন নয়। অনেক স্থানের হিন্দু পরিবারে ছয় পুত্রের পর নির্ব্বিঘ্নে পুত্র হওয়া বড় দুর্ঘট বলিয়া একটা কুসংস্কার আছে। তাহার উপর, ইহার পূর্ব্বে জগদ্ধাত্রীর কয়েকটি সন্তান নষ্ট হইয়াছিল। এই সব কারণে জগদ্ধাত্রী দেবীর পুত্র সন্তান হওয়াতে আজ এত আনন্দ এত কোলাহল। পুত্র জন্মিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে সকল রকম অমঙ্গল হইতে, প্রসূতি ও নবকুমারকে রক্ষা করাও আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে, সূতিকাগারের দরজায় যথাস্থানে রামনাম লেখা হইয়াছিল। কুলোকের কু-নজর হইতে রক্ষার জন্য আঁতুড় ঘরের দরজায় ছিন্ন পাদুকাও ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। ক্রমে

মৃত গরুর সশৃঙ্গমুণ্ডাস্থি আনিয়া তাহা গোময় ও কড়ি দিয়া সাজাইয়া, হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া সূতিকাঘরের নিকট রাখা হইল। এই সকল করিতে করিতে ক্রমে ষেঠেরা পূজার দিন আসিল। পূজার যথারীতি আয়োজন হইল। পুরোহিত আসিলেন। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে একটি কালি-শূন্য দোয়াত, নূতন কলম, তালপাতা এবং নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল। পূজার ব্যাপার শেষ হইল। বিধাতা পুরুষ যাহাতে শিশুর অদৃষ্টে ভাল লিখেন, তাহার জন্য সকলেই প্রার্থনা করিলেন। ষেঠেরা পূজার একদিন পরেই আট কৌড়ে আসিল। ছেলে মহলে আজ মহাধূম। সন্ধ্যার পর আট ভাজা আসিল, পয়সা কড়ি আসিল, ভাঙ্গা কুলা আসিল। ছোট বড় ছেলেরা পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিল। যথাসময়ে "আটকৌড়ে বাট-কৌড়ে ছেলে আছে ভাল" বলিয়া কুশল প্রশ্ন হইল। পরে শিশুর পিতার লাঞ্ছনা হইল। শেষে কুলা বাজাইয়া আঁতুড় ঘরের চালের উপর দিয়া তাহা ফেলিয়া দেওয়া হইল। এদিকে প্রসূতি ভাদ্রের পচা গরমে সেক ঝালের আতিশয্যে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। শিশুটি সর্ব্বদা সর্ষপতৈল-সিক্ত হইয়া দিনে দিনে মাতৃস্তন্যে এবং স্নেহে বাড়িতে লাগিল। আঁতুড় ঘর হইতে বাহির হইবার সময় আবার ষষ্ঠী পূজার দিন আসিল। তাহাও সমাপন হইল। বটতলার ষষ্ঠীদেবীর পূজা হইল।

প্রসূতি একখানি নূতন লালপেড়ে শাড়ী পরিধান করিলেন। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কাজলনাতাখানি হাতে করিয়া প্রসূতি জলধারা দিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ছেলেরা খৈএর পেতে, ক্ষীরের লাড়ু ও কলা পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইল। ধাত্রী প্রভৃতি নববস্ত্র পরিধান করিয়া পুরস্কার লইয়া হৃষ্ট মনে বিদায় হইল। দেওয়ানজীর বাড়ীর আবার পূর্ব্ব অবস্থা আসিল। কোন উৎকণ্ঠা, চিন্তা অথবা একটা ব্যস্ততার ভাব আর দেখা গেল না। প্রসূতিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যথাসময়ে জগদ্ধাত্রী দেবী নবকুমার ক্রোড়ে লইয়া সানন্দে পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। এখানে সোণার চাঁদের ছয়চাঁদে অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ হইবে। হিন্দুগৃহে পুত্র সন্তানের দশসংস্কার আবশুক। সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের জীবনের অনেক উৎসব অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল পবিত্র আনন্দ কমিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের জীবনের সর্ব্বকর্ম্মে ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান হইত। সেই জন্য, লোকে হিন্দুকে এখনও ধর্ম্মপ্রাণ জাতি বলিয়া থাকে। সমাজে নির্ম্মল পবিত্র উৎসব অনুষ্ঠান আমোদ যত বৃদ্ধি পায়, ততই মঙ্গল। ইহা হ্রাস হইলে সমাজের অমঙ্গল হয়—সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ব্বে সামান্য অবস্থার লোকের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে আস্থা ছিল এবং সেগুলি অনুষ্ঠিত হইত।

নিজের অবস্থা অনুসারে শিশুর পিতা পঞ্চদেবতার পূজা

দিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া, শুভদিনে নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন দিলেন এবং তাহার নামকরণ হইল। পুত্রের নাম রাখিলেন শ্রীমান রামতনু লাহিড়ী। মল, বালা, কোমরপাটা, মাদুলীতে ভূষিত, রক্তবর্ণ-পট্টবস্ত্র-জড়িত শিশু রামতনু সেই উপলক্ষে পরিবারস্থ সকলের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন।

পিতৃগৃহ, বাল্যকাল ও পাঠদ্দশা।

রামকৃষ্ণ-নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ ছিল। তিনি রাজা শিবচন্দ্রের দৌহিত্রদ্বয় হরিপ্রসন্ন রায় এবং নন্দপ্রসন্ন রায়ের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহাদেরই বিষয় সম্পত্তি দেখিতেন শুনিতেন। রামকৃষ্ণ ইঁহাদের নিকট সামান্য বেতন পাইতেন। অন্য লোক হইলে জমিদারীর কাজে, আদায়-উসুলে, প্রজাবিলিতে নানা রকমে অর্থ উপার্জ্জন করিত। কিন্তু রামকৃষ্ণের মতি গতি সে দিকে ছিল না। বিষয় বিভবে রামকৃষ্ণ ভাগ্যবান্ ছিলেন না সত্য, কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাগ্যবান ছিলেন ; গৃহে তিনি ভক্তিমতী, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পাইয়াছিলেন। কর্ম্মস্থলে নিষ্ঠাবান, আদর্শ-চরিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ প্রভু পাইয়াছিলেন।

হরিপ্রসন্ন রায় এবং নন্দপ্রসন্ন রায়কে তখনকার লোকে 'বড় লালা' এবং 'নূতন লালা' বলিতেন। ইঁহাদের চারিত্র্য-মাহাত্ম্যের অনেক কথা এখনও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে শুনা যায়। ইঁহাদের কর্ম্মে বেতন অল্প হইলেও, রামকৃষ্ণকে চাকুরীর আনুষঙ্গিক অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা সামান্য সুখের কথা নহে।

রামকৃষ্ণ স্ত্রীর গৃহিণীপনায় এবং অল্পে সন্তোষের জন্য, সেই সামান্য আয়েই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণের আটটি পুত্র সন্তান এবং দুইটি কন্যা হয়; ইহাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রামতনুর পর তাঁহার আর তিনটি ভাই জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের নাম, রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ এবং কালীচরণ। কন্যা ভবসুন্দরী কেশবচন্দ্রের ছোট ছিলেন। রামকৃষ্ণ এবং জগদ্ধাত্রী দেবী তাঁহাদের সেই সামান্য আয়ে ইঁহাদিগকে মানুষ করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ পুত্রগণের সুশিক্ষায় যত্নবান্ ছিলেন। যাহাতে তাঁহারা উত্তরকালে কৃতী এবং সজ্জন হয়েন, তাহার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে পুত্রেরা কুসংসর্গে পতিত না হয়, তাহার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তিনি সন্ধ্যার সময় বিষয়-কর্ম্ম শেষ করিয়া গৃহে আসিতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সায়ং সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করিতেন। কেশবচন্দ্র এবং পরে রামতনুকে সঙ্গে লইয়া, তিনি

কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়ার চৌধুরী বাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়া বসিতেন। এখানে একজন ইংরেজী-নবীশ লোক থাকিতেন। কেশবচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীর ও পাড়ার অনেকে ইঁহার নিকট সন্ধ্যার পর ইংরেজী পড়িতেন। অপরত্র প্রবীণেরা ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। রামকৃষ্ণের এখানেও একটি সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তিনি সাধু এবং সজ্জন-সঙ্গে থাকিতেন। এইরূপ ভাবে কিছুদিন কাটিতে লাগিল।

ক্রমে রামতনু পাঁচ বৎসরের হইলেন। "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি"—এখন বিদ্যারম্ভের সময় আসিল। শুভদিনে রামতনুর হাতে খড়ি হইল। প্রথমে মাটীতে রামখড়ি দিয়া রামতনু দাগা বুলাইতে শিখিলেন। এখনকার মত তখন লেখাপড়া শিখার সুযোগ সুবিধা ছিল না। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, তখন "পেরথম ভাগ" ছিল না শ্লেট পেন্সিল পর্য্যন্ত ছিল না। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রথমে লেখা পড়া শিখিতে যাইতে হইত। যাঁহারা বড় মানুষ তাঁহাদের বাড়ীতে গুরুমহাশয় এবং মিঞাজী দুইজনেই থাকিতেন। তখন পারসী লেখা পড়ার আদর ছিল, মিঞাজীর কাছে ছেলেরা আলিফ্‌ বে, তে, সে, হইতে শিখিতে আরম্ভ করিত। গুরু মহাশয় ক-য়ে কৃষ্ণ, ভ-য়ে ভেটকী মাছ বেগুণে ঠ, কান্তেখানা ছ, হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ, কাঁধে বেড়ি ধ, মাথায় পাগড়ী ঙ, পালান পিঠে ঞ ইত্যাদি উপায়ে বর্ণমালা লেখাইতে এবং পড়াইতে শিখাইতেন।

প্রথমে রামতনু গুরুমহাশয়ের দাগা দেখিয়া তাহার বুলি বলিয়া বর্ণমালা লিখিতে শিখিল। ক্রমে মাটীতে খড়ি দিয়া লেখা উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে বালক তালপাতায় লেখা আরম্ভ করিল। তখনকার ছেলেদের পাঠশালায় যাইবার বেশভূষা সাজ-সজ্জা আড়ম্বর-শূন্য ছিল। সেকালের বালকদের, বিশেষতঃ আদুরে ছেলেদের, আট দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, হাতে বালা থাকিত। রামতনু ধড়া করিয়া কাপড় পরিয়া, কোঁচড়ে মুড়ি-মুড়কির জলপান লইয়া, বগলে ছোট একখানি মাদুর জড়ান পাততাড়ি এবং সেই সঙ্গে লম্বমান দোয়াত লইয়া পাঠশালা যাইত। পায়ে জুতা, গায়ে জামা দিবার প্রথা তখন ছিল না। অথবা এখনকার মত সেলার সুট পরাইয়া ও পায়ে বুট ও মাথায় ষ্ট্র হ্যাট দিয়া ছেলে সাজাইয়া বিদ্যালয়ে পাঠানর কথা কেহ জানিত না। তখনকার অনাবৃত-দেহ, নগ্নপদ, তৈল নিষেক-চিক্কণ বালকেরা এখনকার, ফ্ল্যানেল-জড়িত, বুট-শোভিত, রুটি-বিস্কুট-চা-পুষ্ট বালকগণ অপেক্ষা অধিক সুস্থ, সাহসী এবং বলবান হইত। তখনকার ছেলেরা যে মা বাপের কম আদরের ছিল তাহা নয়। তখনকার ছেলে পাঠশালা হইতে দুপুর বেলা ফিরিয়া আসিলে, মা দরজা পর্য্যন্ত গিয়া "হাতে কালি মুখে কালি গোপাল আমার লিখে এলি" বলিয়া আদর করিয়া তাহাকে কোলে লইয়া আসিতেন। এখনকার ছেলেরা (বিশেষতঃ সহরের) শুধু আদরের হইলে একথা বলিতাম না, কারণ

কোন্ পিতা মাতার সন্তান আদরের নহে? কিন্তু তাহারা যেন একটু বেশী "আদুরে" "আহ্লাদে" হইয়া যাইতেছে। এখনকার গৃহস্থেরা, কি বিত্তশালী, কি মধ্যবিত্ত, আর কি বিত্তহীন, ছেলেগুলিকে ফ্যাসানের দায়ে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কতকগুলি খেয়ালের জন্য, সর্ব্বদা জুতা মোজা ও অতিরিক্ত কাপড় চোপড় পরাইয়া রাখেন। ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন এগুলি গৃহস্থের ঘরসাজান সজীব মোমের পুতুল। একটু রৌদ্র বৃষ্টিতে ইহারা শ্রীহীন হয়। সহরের এই শ্রেণীর বালক বালিকা দেখিলে আমার আর একটি কথা প্রায়ই মনে হয়। সহরের সংকীর্ণ বাসস্থানে গৃহস্থেরা টবে গামলায়, গাছ রাখার ব্যবস্থা করেন এবং অনেক কষ্টে যত্নে সেইগুলিকে রক্ষা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত যত্ন সত্ত্বেও সেগুলি তেমন বাড়ে না তেমন স্বাভাবিক শোভাময় হয় না। ইহার প্রধান কারণ, এই সকল গাছগুলিকে জননী ধরিত্রীর ক্রোড় হইতে দূরে রাখা হয়। জননীর পীযূষ হইতে ইহারা বঞ্চিত। মাতৃস্তন্য ভিন্ন পূর্ণ বিকাশ কোথায় সম্ভব? বর্ত্তমান সময়ের বালক বালিকারা গৃহস্থের এইপ্রকার টবের গাছেরই মত। ইহারা আশৈশব জগজ্জননী প্রকৃতি দেবী হইতে বিচ্ছিন্ন। মৃত্তিকা, রৌদ্র, বায়ু, বৃষ্টি হইতে ইহাদিগকে দূরে রাখিবার জন্য ভ্রান্ত জনক জননী কতই না চেষ্টা করেন। হায় ভ্রম বুদ্ধি!

যাহা হউক, তখনকার প্রথা না থাকার জন্যই হউক,

আর অবস্থার জন্যই হউক, অথবা উভয় কারণেই হউক, রামতনু সেইরূপ সামান্য বেশেই পাঠশালায় যাইত। রামতনু তখন "বড় সুবোধ বালক" ছিল না আর "সর্ব্বদাই লেখা পড়া"ও করিত না। দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গদোষেই হউক, অথবা গুরু মহাশয়ের তাড়নার ভয়েই হউক মাঝে মাঝে পাঠশালা যাইত না। কিন্তু বাপ মা বুঝাইলে, অভয় দিলে রামতনু আবার পাঠশালায় যাইত। এই ভাবে ২।৩ বৎসর কাটিয়া গেল। রামতনুর উপনয়নের সময় উপস্থিত হইল। রামকৃষ্ণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। পুত্রের উপনয়ন যাহাতে যথাকালে হয় তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল। ইহা ছাড়া গুরু পুরোহিতেরা তাঁহাকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা শুনাইয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন "গর্ভাষ্টমাব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্" —গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে। সুতরাং শুভদিনে বালক রামতনুর উপনয়নের উদ্যোগ হইল। হোমের এবং চরুপাকের দ্রব্যাদি আসিল, গৈরিক বসন, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, শরপত্র, যজ্ঞমেখলা, যজ্ঞোপবীত, সুবর্ণ কুণ্ডল, বেড়িবংশের দণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইল। উপনয়ন উপলক্ষে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে উৎসব হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব ভোজন, তৈল তৈজসাদি বিতরণ হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণের অবস্থা তেমন সচ্ছল না থাকাতে তিনি এদিকে বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। তবে একথা নিশ্চয় যে "আনন্দলাড়ুর" অভাব হয়

নাই। যা'ক। রামকৃষ্ণ উপনয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার কোন ত্রুটী করেন নাই। যথাকালে রামতনুর সুন্দরকেশগুচ্ছ মুণ্ডিত হইল। কর্ণ কুণ্ডলে শোভিত হইল। গৈরিকবস্ত্রপরিহিত, মৃগচর্ম্ম-উপবীতধারী, দণ্ড ও ঝুলি লইয়া বালক ব্রহ্মচারী মাতার নিকট "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলিল। চতুর্থ দিনে রামতনু গৃহের বাহির হইল। রামতনু বালক হইলেও "নূতন ব্রাহ্মণ।" রামকৃষ্ণও বালক রামতনুকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী শিখাইতে লাগিলেন। পিতার সঙ্গে রামতনু বলিতে লাগিল "ওঁ ভূর্ভুবঃস্বস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।"*

বালক ইহার গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। ধার্ম্মিক রামকৃষ্ণ পুত্রের হিন্দুধর্ম্মের দীক্ষা এই ভাবে সমাপন করিলেন।

---

* গায়ত্রীর অর্থ :—

যিনি স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি দেবতাদিগেরও আরাধ্য এমন বরণীয় ঈশ্বর আমি তাঁহার ধ্যান করি।

গায়ত্রী জপ করিবার সময় উহার অর্থ যেরূপ ভাবে ধ্যান করা আবশ্যক তাহার সম্বন্ধে উপদেষ্টা বলেন :—

সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে তেজোময় ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ সাধনে বারম্বার প্রেরণ করিয়া থাকেন, যিনি ত্রিলোকের অন্তর্ভূত থাকিয়া পৃথিবী আকাশ এবং স্বর্গ প্রকাশ করিতেছেন, জন্ম মৃত্যু এবং ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের জন্য সেই ত্রিলোকী-ভূত সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হৃদয়স্থিত উপাস্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আহা কি সুন্দর এবং গভীর ভাব। কিন্তু বালক ইহার কি বুঝিবে?

পৈতার গোলমাল কয়েকদিনের পর শেষ হইল। রামতনু আবার পূর্ব্বের মত পাঠশালায় যাইতে লাগিল; লেখাপড়া করিতে লাগিল, সমবয়স্ক বালকদের সহিত আগে যেমন মিশিত তেমনই মিশিতে লাগিল। রামতনু ক্রমে বড় হইতে লাগিল। এখন আর রামতনুর কেবল পাঠশালার শিক্ষা যথেষ্ট নহে বিবেচনা করিয়া রামকৃষ্ণ পুত্রের অল্প ফারসী এবং ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বোধ হয় দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ীতে পুত্রের এই দুই ভাষা প্রথম শিক্ষার সুবিধা হয়।

রামতনুর বাল্য জীবনের অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে সেকালের পাঠশালা এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গুরু মহাশয়ের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক।

ইংরাজেরা আমাদের দেশের ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। পাঠশালা, মক্তব এবং চতুষ্পাঠী বা টোল। সেকালে ছাপার বই খুব কম প্রচলিত ছিল। মকতবে এবং টোলে হাতে লেখা বই পুঁথি পড়ান হইত। পাঠশালায় লিখন পঠন এবং হিসাব শিখান হইত। হাতের লেখা এবং হিসাবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। তালপাতা শেষ হইলে কলাপাতা, তাহার পর কাগজে লেখা শিখান হইত। "সেবকশ্রী" "আজ্ঞাকারী" পাঠযুক্ত পত্র, পাট্টা, কবুলিয়ৎ, চিঠা, কবজ প্রভৃতি কিরূপে ভাল করিয়া লিখিতে হয়,

তাহা শিখান হইত। গণিতের মধ্যে শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়কিয়া, পণকিয়া, চৌকিয়া, হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তেরিজ জমা খরচ, গুণভাগ, মাস-মাহিনা, বৎসর-মাহিনা, কাঠাকালি, বিঘাকালি ইত্যাদি শিখান হইত। গ্রাম্য জীবনে, জমিদার মহাজনের সহিত আদান প্রদানে অথবা তাহাদের অধীনে কর্ম্ম করিবার জন্য এই পর্য্যন্ত শিক্ষাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। যে সকল অবস্থাপন্ন পরিবারের যে সকল বালক ইহার অপেক্ষা উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিত, যাহারা রাজ-সরকারে উচ্চপদ লাভের ইচ্ছা করিত, তাহারা ফারসী-নবীশ মিঞাজীর নিকট "আলিফ্," "বে" "তে" "সে" হইতে আরম্ভ করিয়া হাতে লেখা, গুলেস্তা, বোঁস্তা প্রভৃতি কেতাব পাঠ করিত। ইহার উপরও যাহারা শিখিতে চাহিত, তাহারা ভাল মৌলভী প্রভৃতির নিকট ফারসী আরবী পর্য্যন্ত শিখিত। ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছেলেরা একটু ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে টোলে যাইতে হইত। সেখানে ব্যাকরণ কাব্য শেষ করিলে তাহারা আপন আপন রুচি অনুসারে ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা করিত।

রামতনুর প্রথম শিক্ষা।

সেকালের প্রথম শিক্ষার প্রথম স্থান পাঠশালার কথাই এখন একটু বিশেষ ভাবে বলা যাউক। এখনকার মত

তখন পাস-করা গুরু মহাশয় ছিল না। বর্দ্ধমান অঞ্চলের কায়স্থ বা উগ্রক্ষেত্রী জাতীয় লোকেরা প্রধান প্রধান গ্রামের বড় লোকের বাড়ীতে পাঠশালা খুলিত। প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণে দুই আড়াই ঘণ্টা পাঠশালা বসিত। পাঠশালায় চেয়ার টেবিল বা বেঞ্চ থাকিত না। ব্ল্যাক বোর্ডও থাকিত না। ছেলেরা আপন আপন বসিবার আসন অর্থাৎ ছোট ছোট মাদুর, তালপাতা বা খেজুর পাতার তৈয়ারি চেটা ও ছোট চৌকোনা দোয়াত লইয়া যাইত। গুরু মহাশয় মোড়া অথবা মাদুরে বসিতেন। তাঁহার হাতে এক গাছি তেলে পাকান লক্‌লকে বেত থাকিত। এবং নিকটে হুঁকা কলিকা শোভা পাইত।

পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য কিছু কিছু মাহিনা দিতে হইত। উৎসবে পর্ব্বে পার্ব্বণী দিতে হইত। মধ্যে মধ্যে সিধা চাল দাল নুন তেল তরকারিও দিতে হইত। ইহা ছাড়া গুরু মহাশয়ের বাসার সামান্য সামান্য কাজগুলি পড়োরা অনেক সময় করিয়া দিত। এই সকল ন্যায্য প্রাপ্তি ছাড়া গুরু মহাশয়ের অন্য উপায়েও আয় ছিল। পড়োরা গুরু-মহাশয়ের অনুগ্রহ পাইবার আশায়, বাবার ভাল তামাকটুকু, মার তৈয়ারি কোন খাবারটুকু, পুকুরের মাছটা, বাগানের কলাটা মূলাটা লুকাইয়া দেখাইয়া গুরুমহাশয়ের সেবার জন্য আনিত। কিন্তু এই উপায়ে সকল বালকের সকল ত্রুটীর মার্জ্জনা হইত না। যে সকল বালক এই প্রকারে তুষ্ট

করিতে না পারিত এবং লেখা পড়ায় অমনোযোগী তাহাদের আর লাঞ্ছনার শেষ থাকিত না। একেই গুরুমহাশয় জানিতেন "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" তাহার পর আর সকলেই জানিত :—

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রং চ শিষ্যং চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥

এরূপ স্থলে ছেলেদের কঠোর শাস্তি দিবার জন্য কোন অভিভাবকও কখন তেমন আপত্তি করিতেন না। অতএব ছেলেদের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইত তাহার আর বিচিত্র কি? পাঠশালার দণ্ডের অনেক রকম ছিল। এখনকার মত "ষ্টাণ্ড্ আপ্" "ষ্টাণ্ড্ আপ্ অন্ দি বেঞ্চ," "নীল ডাউন" "পুল্ হিম্ বাই দি ইয়ার" প্রভৃতি কোমল শাস্তি ছিল না। পাঠ-শালায় আসিতে দেরি হইলে, অথবা সেই রকম কোন ত্রুটী হইলে হাতে ছপাছপ্ দুই চারি ঘা বেত দিয়া শেষ হইত। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া পাঠশালা কামাই করিলে, আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, পাঠশালা হইতে পলাইলে, সে ছাত্রের আর রক্ষা ছিল না। সর্দ্দার পড়োরা এই প্রকার দুষ্ট বালককে ধরিবার জন্য আদিষ্ট হইত। তাহারা অনু-পস্থিত বা পলাতক বালককে যেখানে যে অবস্থায় পাইত, ধরিয়া আনিত। চারি জন বলবান বালক তাহার চারি হাত ধরিয়া 'চ্যাং দোলা' করিয়া

'গুরু মশাই গুরু মশাই
তোমার পড়ো হাজির"

বলিতে বলিতে পাঠশালায় উপস্থিত হইত। তখন অপ-রাধী বালকের পুর্ব্বের আচরণ এবং বর্ত্তমান অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বিচারক গুরু মহাশয় প্রথমে ছপা-ছপ্ কয়েক ঘা বেত মারিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া পরে "ইটে খাড়া, "নাড়ুগোপাল," "জলবিছুটী" "ত্রিভঙ্গ মুরারি" প্রভৃতি নানাপ্রকার দণ্ডের কোন না কোনটি দিতেন। রামতনুও এইরূপ পাঠশালায় প্রথমে লেখা পড়া শিখিয়াছিল এবং পূর্ব্ব-বর্ণিত দণ্ডের কোন না কোনটি ভোগ করিয়াছিল। শুনা যায় রামতনু শাস্তির ভয়ে মধ্যে মধ্যে পাঠশালা কামাই করিত।

এ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের নির্দ্দয় আচরণের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু সে সময়কার ছেলেদের গুণের কথাও বলা আবশ্যক। তখন দেশে এত ব্যারাম ছিল না। পল্লী-গ্রাম এত অস্বাস্থ্যকর ছিল না। এখনকার ছেলেরা "ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা" যায়। তখনকার ছেলেদের শরীরে বল যথেষ্ট ছিল। তাহাদের বাল্যসুলভ দুষ্টামিও সেইরূপ ছিল। সেরূপ ছেলেদের শাসন করিতে হইলে অনুরূপ সাজা হওয়া আবশ্যক। তাহার পর তাহাদের দুই চারি ঘণ্টার জন্য দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের অপমান বোধ হইত না— ক্লেশ বোধ হইত। আর এক কথা, সে সকল বালকের দৌরাত্ম্যও অত্যন্ত বেশী ছিল। গুরুমহাশয়ের আসনে বাবলার কাঁটা লুকাইয়া রাখা, তাহার হুঁকা অপবিত্র করিয়া

দেওয়া, এবং অন্যান্য নানা উপায়ে তাঁহাকে উত্যক্ত করা নিত্য ঘটনা ছিল। এরূপ স্থলে গুরুমহাশয়ের দণ্ডের মাত্রা অনেক সময় বেশী হইত।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষাদানরীতির সহিত তুলনা করিলে পূর্ব্বকার শিক্ষাদানরীতি অসম্পূর্ণ এবং ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তখনকার দেশকাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় উহা তেমন দোষাবহ ছিল না। সুসভ্য ইংরাজদিগের মধ্যেও ছাত্রশাসন-নীতি যে কঠোর ছিল তাহা "Spare the rod, spoil the child" এই প্রবাদ বাক্য হইতেই বুঝা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্যশিক্ষক ইংরাজ ছাত্রদিগের নিকট কিরূপ ভয়ঙ্কর জীব ছিল, তাহা সুবিখ্যাত কবি গোল্ডস্মিথের 'পরিত্যক্ত পল্লী' (Deserted Village) নামক কবিতা হইতে জানা যায়। কবি বলিয়াছেন :—

A man severe he was ; and stern to view
I knew him well ; and every truant knew ;
Well had the boding tremblers learn'd to trace
The day's disasters in his morning face ;

* * * * * * *

Full well the busy whisper circling found ;
Convey'd the dismal tidings when he frown'd :

প্রকৃতি না বুঝিয়া যে শিক্ষক একই প্রকার দণ্ড সকল ছাত্রের উপর বিধান করেন তিনিই নিন্দার্হ। সচরাচর

দেখা যায় কোন বালক স্বভাবতঃ ধীর মৃদু, কোন বালক বা স্বভাবতঃ উদ্দাম-অস্থির; কোন বালককে মিষ্ট কথায় সংশোধন করা যায়, কোন বালককে কঠোর দণ্ড বিনা বশে রাখা যায় না। এরূপ স্থলে সামান্য বিলম্বে, বা তাদৃশ কোন ক্রটীতে দুষ্ট ও শিষ্ট বালককে সমান দণ্ড দেওয়াই নিন্দার কথা। সেকালের ছাত্রশাসনের কঠোরতর দণ্ডের যেমন নিন্দা করা যায়, একালের দণ্ডের একান্ত কোমলতা এবং কোথাও কোথাও তাহার আদৌ অভাবও হিতকর বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে লোকের একটা ধারণা হইয়াছে যে লেখা পড়া শিখিতে ছেলেদের যেন এক ফোঁটা চোখের জল না পড়ে—হাসি খেলার সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা এই পদ্ধতির পোষক এবং যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শাসন-পদ্ধতির বিরোধী, তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে বালকগণের সমস্ত জীবনটা হাসিয়া খেলিয়া কাটিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। সংসার-সংগ্রাম ক্ষেত্রের ঘটনাসকল অন্যরূপ, বাল্য হইতে কঠোরতার সহিত পরিচয় হওয়া আবশ্যক। গুরু লঘু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমার বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ে এই শিক্ষা পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণে আমাদের বালকেরা যেন কিছু বেশী অশিষ্ট এবং চপল হইতেছে। তাহাদিগের নিকট কোন বিষয়ই পবিত্র গুরু, গম্ভীর বলিয়া বোধ হয় না। কেবল মিষ্ট দ্রব্য খাওয়াইলে শিশু সুস্থ সবল এবং পুষ্ট হয় না। মধ্যে মধ্যে কটু

তিক্ত দ্রব্যও খাওয়াইতে হয়। শিশুর অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহার চোখের জলের সহিত উহা খাওয়াইতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন হাসি খেলার সহিত শিক্ষাদান-নীতির সমর্থকগণের একথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

পাঠশালা ও গুরু মহাশয়ের বর্ণনার সহিত প্রাচীন এবং বর্ত্তমান শিক্ষা ও ছাত্রশাসন-প্রণালীর তুলনায় সমালোচনা আসিয়া পড়িল। যাহা হউক, আশা করি ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

রামতনুর প্রথম শিক্ষা পূর্ব্ব-বর্ণিত সেকালের পাঠশালা ও গুরু মহাশয়ের শাসনের মধ্যে হইয়াছিল। পাঠশালায় ত লিখন পঠন ইত্যাদি শিক্ষা হইতে লাগিল। কিন্তু পাঠ-শালার বাহিরে বাল্যে রামতনু কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিল তাহাও জানা আবশ্যক।

তখন কৃষ্ণনগর নগর হইলেও, কলিকাতার মত উহা কেবল ইট কাঠ পাথরের পাকা বাড়ীতে পূর্ণ ছিল না। সহরের ভিতরে গাছপালার অভাব ছিল না। সহরের বাহি-রেও বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, ঋতুভেদে হরিৎ ও পীতবর্ণে শোভা পাইত। নগরের নিকটে অনেক আম জাম কাঁঠাল তাল নারিকেল প্রভৃতির বাগান ছিল। এই সকল বাগান ছাড়াও ধনিগণের প্রমোদ-কাননও ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজার সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীবন' তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ-নগরের পাশ দিয়া নদী গিয়াছে। প্রকৃতিদেবী কৃষ্ণচন্দ্রের

নগরকে নিসর্গ-শোভায় সাজাইতে কৃপণতা করেন নাই। বড় বড় নগরের মধ্যে যে সকল বালক বালিকারা বাস করে, তাহারা প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্ত্তন জানিতে পারে না। তাহারা বাটীর ছাদে উঠিয়া বসন্তের শীতল বায়ু সেবন করে। কিন্তু বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমের মুকুল, থোপা থোপা শিরিষ ফুল, অশোকের গুচ্ছ, পত্রহীন পুষ্পময় শিমুল গাছ, কচি কচি পাতাভরা বট অশ্বত্থের গাছ ক্বচিৎ দেখিতে পায়। তাহারা বসন্তের সাথী কোকিল, পাপিয়া ও দহিয়ালের দিগন্ত-প্লাবী সুমিষ্ট স্বর অল্পই শুনিতে পায়। তাহাদের পরিবর্ত্তন-হীন বাড়ী, তাহার কক্ষগুলি, তাহাদের পাড়ার অট্টালিকা-শোভিত বড় বড় রাজপথ গুলিকে বৎসরের ৩৬৫ দিন একই ভাবে দেখিতে পায়। উদয়াস্ত সেই লোকের ভিড়, তাহা-দের ছুটাছুটী, গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ, ফেরিওয়ালার চীৎকার বার মাস ত্রিশ দিন শুনিতে থাকে। ফেরিওয়ালার মুখেই তাহারা আগে ঋতু পরিবর্ত্তনের কথা শুনিতে পায়। টোপা কুল, কচি আমের কথা তাহারাই শুনায়।

কিন্তু কৃষ্ণনগরের মত খানিক সহর খানিক পল্লী গ্রামের মত স্থানে ছেলেরা গাছের প্রথম পাতাটি ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার প্রথম পাতাটি আর প্রথম মুকুলটি দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ঋতু-পরিবর্ত্তন জানিতে পারে। কোন্ বাগানের কোন্ গাছে কোন্ ডালে কোন্ ফলটি আগে পাকিয়াছে, তাহারা তাহা জানিতে পারে। আবার কোন্

গাছের কোন্ ডালে দহিয়াল বা বুল্‌বুল বাসা করিয়াছে, সে খবর তাহারা বলিতে পারে। কোন্ পাখী কোন্ ফড়িং খাইতে ভালবাসে সে খবরও তাহারা রাখে। গোয়ালা বুড়ীর বাড়ীর যে গাছের কুল মিষ্ট, যে গাছের কুল টক তাহারা বেশ জানে। বাবুদের বাগানের যে গাছটির আম কাঁচা মিঠা, তাহার প্রতি ছেলেদের প্রথম হইতে নজর থাকে। বর্ষার দিনে ছিপে মাছ ধরিবার উৎসাহ তাহাদেরই অধিক। যে মাছ ধরিবার জন্য যে টোপ ভাল, তাহা অনায়াসে বলিতে পারে।

পল্লী গ্রামে বালকেরা প্রকৃতির সহিত এমনই ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া, মিলিয়া মিশিয়া বর্দ্ধিত হয়,—বাল্যে রামতনুর ভাগ্যে এই নির্ম্মল সুখলাভ ঘটিয়াছিল।

কৃষ্ণনগরে তখন হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল। জন সাধারণ সেই সকল পূর্ব্বে উৎসবে মনঃপ্রাণের সহিত যোগ দিত এবং আনন্দ উপভোগ করিত। ছেলেদের ত কথাই নাই। বাবুদের বাড়ী দুর্গোৎসব; পাড়ার ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নাই। পূজার বাড়ীতে প্রতিমার কাঠামর দিন হইতে বিজয়ার দিন পর্য্যন্ত ছেলেরা কিরূপ আগ্রহ, উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কাটায় তাহা বলা যায় না। কুমারের নিকট হইতে প্রতিমা গড়ার একটু মাটি, মালীর নিকট হইতে একটু সাজের শোলা, জরি বা রাংতা পাইবার জন্য কতই না আগ্রহ প্রকাশ করে আর তাহা

পাইলে কতই না আনন্দ! আবার তাহারই জন্ম জন্ম আপোষে কত ঝগড়া কলহ!

আশ্বিন মাস গেল, উৎসবের শেষ হইল না—কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসযাত্রা, কার্ত্তিকপূজা একে একে আসিল—যাইল।

ক্রমে পৌষ পার্ব্বণ উপস্থিত হইল। ছোট বড় সকলের ক্ষেতে খামারে অল্প বিস্তর ফসল আছে। সুতরাং লোকে উপস্থিত অভাবের দায় হইতে মুক্ত। সকল গৃহস্থই পৌষ পার্ব্বণের জন্ম উদ্যোগ করিতেছে। ছেলেরা আহ্লাদে, পিঠেপুলি খাইবে বলিয়া মহা আহ্লাদিত। যথাকালে গৃহস্থের বাড়ীতে রন্ধনের ধূম আরম্ভ হইল।

"মেয়েদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলো চুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥"

পৌষ পার্ব্বণের এমনই ব্যস্ততা। ইহার মধ্যে ছেলেরা কি স্থির থাকিতে পারে? নলেন গুড়ের পরমান্নের গন্ধে পাড়া আমোদিত। আহা সে পরমান্নের গন্ধে ছেলেরা যে নাচিবে তাহা আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বের সে কথা মনে হইলে এখনও অনেক বৃদ্ধ বাঙ্গালীর রসনায় রসের সঞ্চার হয়।

পৌষ পার্ব্বণের পিঠা পরিপাক হইতে না হইতে মাঘ মাস আসিল। ছেলে মহলে সরস্বতী পূজার প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। পূজার আমোদ ত আছেই। কিন্তু প্রাণ ভরিয়া মনের সাধে লুকাইয়া দেখাইয়া কুল গুলি টুপটাপ্ পাড়িয়া কুপ কাপ্ খাইবার আমোদটা অনেক ছেলের মনে বেশী। ক্রমে ছেলেরা সরস্বতী পূজার দিন গণিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে গাছের দিকে আর মাঠের দিকেও আগ্রহের সহিত তাকাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কুলগুলির রং বদলাইতে লাগিল, আম গাছের ডালে ডালে বউল দেখা গেল, ক্ষেতের মটরশুটি বড় হইতে লাগিল, যবের শীষ মাথা তুলিয়া দেখা দিল। বাকসের ফুল ফুটিল। প্রকৃতি যেন ছেলেদের বলিতে লাগিল,—"তোমাদের পূজার আয়োজন আমি করিয়া দিয়াছি, তোমরা এস।" এদিকে "সময়"ও ছেলেদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি দেখিয়া আপনাকে হ্রাস করিতে লাগিল। সপ্তাহ সঙ্কুচিত হইয়া "নরশু" হইল, ক্রমে "তরশু" "পরশু," এবং "পরশু" "কাল"এ আসিয়া উপস্থিত। তাহার পর বিষম উৎকণ্ঠায় রাত্রি প্রভাত হইয়া "আজ" উপস্থিত হইল। দিনের আলোক দেখা দিবার আগে পাড়ার ছেলের দল একত্র হইল। মাঠ হইতে মটর-শুটি যবের শীষের সংগ্রহ হইল, বাগান হইতে আমের বউল আসিল। বাকসের ফুল ও অন্যান্য ফুল পাতাও সংগৃহীত হইল। ক্রমে যথা সময়ে ছেলেরা—

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥

মন্ত্র বলিয়া পূজা শেষ করিল।

ছেলেরা পূজার আমোদে, পাঠশালার ছুটী পাইয়া বড়ই সুখে ছিল। কিন্তু সুখের দিন কাটিয়া গেল। আবার বীণাপুস্তকরঞ্জিতা ভগবতী ভারতীর বরপুত্র বেত্র-হুঁকা-কলিকাশোভিত গুরু মহাশয়ের নিকট যাইতে হইবে, বলিয়া তাহারা বিষণ্ণ মনে রাত্রি কাটাইল। যাহা হউক আবার লেখা পড়া খেলা ধূলা চলিতে লাগিল। শীতের অত্যাচার চলিয়া গিয়াছে। ছেলেরা এখন মনের সাধে কবাটী, গুন-কোট, কাণা মাছি, লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিল। তখন ক্রিকেট ফুটবল, হকি ছিল না। ক্রিকেটের বদলে ডাণ্ডা গুলি ছিল। এ সকল, দেশীয় খেলা ক্রমে লোপ পাইতেছে। যা'ক, মাঘ ফাল্গুন গেল। চৈত্র আসিল, ঢাকে কাঠি পড়িল। শিবের গাজন হইবে। দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, গলায় পৈতার গোছা দিয়া, রঙ্গিন কাপড় কাঁধে লইয়া, চন্দন মাখিয়া "সন্ন্যাসী" হইল। সন্ন্যাসীর দল তখন বুড়োশিবের শিষ্য। কয়েকদিন বুড়ো শিবতলায় মহাধুম। শেষে চৈত্র সংক্রান্তি আসিল। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাড়ী ঘটোৎ-সর্গ হইল। গৃহস্থেরা সে দিন ছাতু খাইল। চড়কপূজা হইল। সন্ন্যাসীরা ঢাকের বাদ্যের সহিত নাচিতে নাচিতে চড়কতলায় গেল। সেখানে তাহারা চড়ক গাছে, বুকে

পিঠে গামছা বাঁধিয়া পাক খাইল। চড়কতলায় কত লোকে কত রকমের সং সাজিয়া আসিল। ছেলেরা তামাসা দেখিল, আর বাড়ী আসিবার সময় কচি আম কাটিবার জন্ত চড়ুকে ছুরি কিনিয়া আনিল। বাঙ্গালীর বৎসর শেষ হইল। পরদিন শুভ ১লা বৈশাখ আসিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর বুড়ো শিবতলায় হাতের লেখা পুঁথি লইয়া নববর্ষের ফলাফল বলিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ পৈতা এবং পয়সা কড়ি ফল হাতে করিয়া আগ্রহের সহিত নূতন বৎসরের ফলাফল শুনিতে লাগিল। দৈবজ্ঞ ঠাকুর নব পঞ্জিকা শ্রবণের পুণ্য-ফল কি, তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং শেষে এই শ্লোকটি ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন—

গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং ফলং ভোজ্যং সবস্ত্রকং।
শক্তিতো দক্ষিণা দেয়া ইতি দেবৈঃ পুরোদিতম্॥

বাঙ্গলার বাঙ্গালীর—পল্লীগ্রামের বাঙ্গালীর বৎসর, এই রূপে তখন আসিত যাইত। বাঙ্গালীর ছেলেরা এই সকল আমোদ আহ্লাদের মধ্যে হরিণশিশুর মত মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতির ক্রোড়ে বৃদ্ধি পাইত।

রামকৃষ্ণের পুত্র রামতনুর বাল্যজীবনে ইহার কিছুরই বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মত স্থানে বাসের সুবিধা অসুবিধা দুই ছিল। রামকৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও রামতনুকে অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে রাখিতে পারেন নাই। শুনা যায় একজন সমবয়স্ক বালকের কুসঙ্গে পড়িয়া

রামতনু পরের দ্রব্যে লোভ করিত এবং অসৎ উপায়ে তাহা লইত। এই কু-অভ্যাস অল্পে অল্পে বাড়িতেছিল। নানা কারণে মানুষ অপকর্ম্ম করে। সখ যখন অবস্থার বাহিরে যায় তখন তাহা বহু অনর্থের কারণ হয়। রামতনুর একবার সেইরূপ সখ হইয়াছিল। রামতনুর ঘোড়ায় চড়িবার খুব সখ ছিল। রামতনুর বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে এখনকার মত এত গাড়ী ঘোড়া ছিল না। তখনও ছেলেরা পাড়ার পথের ধারে ছাড়া ঘোড়া দেখিলে, তাঁহাকে লইয়া মজা করিত; কেহ বা তাহার উপর চড়িয়া বসিত, আর সব ছেলেরা মিলিয়া বলিত—

ঘোঁড়া ঘোঁড়-ঘোঁড়াতে যাবি।
ঘোঁড়া বেগুন-পোড়া খাবি।

ছেলেদের হাততালিতে ও কোলাহলে ঘোড়া ভড়্কাইয়া যাইত, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইত। সৌভাগ্যের বিষয়, যে সকল ঘোড়া লইয়া বালকেরা এই প্রকার তামাসা করিত সে গুলি অশ্বিনী-নন্দনের অযোগ্য বংশধর—সাধারণতঃ "বেটো" ঘোড়া নামে পরিচিত। আরোহী বা চালক কশাঘাত করিলে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কিছু পথ দ্রুত যাইত। তখন এই বেচারাদের চালচলন অঙ্গ-সঞ্চালন দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা আরোহী বা চালককে বলিতেছে, "যাচ্চি যাবো, যাচ্চি যাবো,—মারচো কেন, মারচো কেন!" রামতনু এবং তাহার বন্ধু এই রকম পরের ঘোড়া চড়িয়া

আর তৃপ্ত হইল না। নিজেদের ঘোড়া চাই। কিন্তু টাকা কোথায় ? বন্ধু অন্যের টাকার দিকে কুদৃষ্টি করিতে লাগিল। রামতনুও তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। ক্রমে সকল কথা প্রকাশ হইয়া গেল। রামতনুর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সে সকল কথা শুনিলেন। রামতনুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্র রামতনুকে অত্যন্ত ভৎসনা করিলেন। রামতনু কাঁদিতে লাগিল। রামতনু তিরস্কৃত হইল, কিন্তু তাহার দোষ স্বীকার করিবার সাহস হইল না। রামতনু কাঁদিতে লাগিল। রামতনুর জন্য এখন সকলেই চিন্তিত হইলেন। রামতনুকে কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখা আবশ্যক হইয়া উঠিল।

রামতনুর প্রথম প্রবাস যাত্রা।

১৮২৬ সাল। (খৃঃ অঃ)। পূজার ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেশবচন্দ্র কর্ম্মস্থান কলিকাতায় ফিরিবার কথা ভাবিতেছেন। ইহার মধ্যে একদিন পিতা পুত্রে কথা হইতেছে—

কেশবচন্দ্র—তনুর দুষ্টামি ত দিন দিন বাড়িতেছে ; লেখা পড়াও ত তেমন হচ্চে না। পাঠশালায় যা বিদ্যে হবার তা ত হয়েছে। উহার লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে ত ?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বুঝি। কিন্তু কি বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে তাই ভাবিতেছি। তনু পাঠশালা যাওয়া ত এক রকম বন্দ করিয়াছে। বলে, গুরু মশায়ের আর বিদ্যা

নাই। সেকথাও মিথ্যা নহে। পাঠশালায় চিঠা লেখা, শুভঙ্করীর প্রায় সব অঙ্ক ছাড়া আর বেশী কি শিখাইবে? আমি চেষ্টা বেষ্টা করে, বলে কয়ে, ত চৌধুরীর বাড়ীতে উহার সামান্য ইংরাজী এবং পারসী শিখিবার বন্দোবস্ত করেছি। কিন্তু সে সামান্য বিদ্যায় ত কাজ হবে না। আমার ইচ্ছা তনু একটু ভাল করে লেখা পড়া শিখে। তবে তনু যেরূপ দুষ্ট হইয়াছে, তাতে উহাকে এখান হতে অন্যত্র না রাখিলে কিছুই হবে না।

কেশবচন্দ্র—বাবা, আমারও বড় ইচ্ছা তনু ভাল করে ইংরাজী লেখা পড়া শিখে। কলিকাতায় আমি রোজই দেখিতে পাই ইংরাজী-নবীশদের খুব আদর। যে রকম দিন কাল আস্‌চে, তাতে পারসী-নবীশ আর টুলো পণ্ডিতের আদর কমিতেছে, ক্রমে তাহাদের অন্ন হওয়া ভার হবে।

রামকৃষ্ণ—কেশব, তুমি মনে কর আমি ওসব কথা ভাবি নাই! তা নয়। তনুকে রাজবাড়ীতে চাকরী করিতে দিব না। টোলেও পড়াব না। তাহলে এতদিন নবদ্বীপে পাঠাইতাম। আমার ইচ্ছা তনু ইংরাজী শিখে একটা মানুষের মত হয়। শুনিয়াছি কলিকাতায় না কি ইংরাজী পড়াবার ভাল বিদ্যালয় হয়েছে। কে একজন সাহেব না কি এ বিষয়ে ভারি উদ্যোগী। তনুকে তুমি সঙ্গে রাখিলে কেমন হয়?

কেশবচন্দ্র—আজ্ঞে ভালই হয়। তবে কি না খরচে কুলান

হওয়া চাই। আমি ত ত্রিশটী টাকা মাহিনা পাই আর সকাল সন্ধ্যা মেহনৎ করে লোকের মামলা মোকদ্দমা তদ্বির পৈরবী করে আরও দু দশ টাকা পাই। তা ত সবই আপনি জানেন। কিন্তু এখানে বাড়ীর খরচের টাকা পাঠাইয়া বাকী যা থাকে তাতে আমারই কষ্টে চলে। তার উপর তনুর খরচ চলিবে কি' ? আমার তাই ভয় হয়। আর নহিলে তনু আমার সঙ্গে চলুক না কেন, আপনি যে বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছেন তাহার নাম আমি শুনিয়াছি, উহার নাম স্কুল সোসাইটীর স্কুল। আর যে সাহেবটির কথা বলিতেছেন তিনি নাকি দেবতুল্য। তাঁহার নাম হেয়ার সাহেব। তিনি দয়া করিলে তনু বিনা মাহিনায় সেখানে পড়িতে পারে। এ সব সম্বন্ধে ত গোল নাই। কথা হচ্ছে, সে স্কুল আমার বাসা থেকে অনেক দূর। আমার বাসা কালীঘাটের আরও দক্ষিণে চেতলায় আর সাহেবের সে স্কুল বউবাজারের আরও উত্তরে পটলডাঙ্গায় ; তনু কি রোজ দুবেলা অতটা পথ যেতে আস্‌তে পারবে ? আর পারলেও পড়বে কখন ? যেতে আসতেই ত অনেক সময় যাবে।

রামকৃষ্ণ – তবে উপায় ? আমার ইচ্ছা তোমরা দুই ভাইয়ে এক সঙ্গে থাক। তোমার কাছে শাসনে থাকিবে। কুসঙ্গ থেকে দূরে থাক্‌বে। তনুকে এখানে শাসন করাও মুস্কিল। তোমাদের গর্ভধারিণী তনুকে শাসন করিলে

বিরক্ত হন। তনুর আগে দুই তিনটি ছেলে মারা যাওয়াতে ও একটু বেশী আদুরে হয়েছে। ওকে তুমি এইবারই সঙ্গে লইয়া যাও। এখানকার খরচের টাকা না হয় কিছু কম করে পাঠাইবে। এখানে কোন রকমে চলে যাবে। সেখানে তোমাদের যেন কষ্ট না হয়।

কেশবচন্দ্র—যে আজ্ঞা। তাহলে ওর কাপড়-চোপড় বই-টই যা কিছু সঙ্গে দিবার সে সব গোছান হউক। ফিরিবার বেশী দিন নাই। কিন্তু কথা হচ্চে আমরা ত সব ঠিক করিলাম। মা ওকে যেতে দিতে রাজি হবেন! আর তনু আপনাদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে ত?

রামকৃষ্ণ—আচ্ছা সে সব হবে। তোমাদের গর্ভ-ধারিণী একেই ত আদর দিয়ে তনুকে নষ্ট করেছেন, এখন না ছেড়ে দিলে হবে কি? চিরকাল কি মূর্খ হয়ে থাক্‌বে। আর তনু—তা সে তোমার কাছে বেশ থাক্‌বে। এখন ত আর সে নিতান্ত খোকা নয়। হাঁ একটা কথা। আমার ইচ্ছা তোমরা ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা কর। তনুর এই প্রথম বিদেশে যাওয়া। আর সকলেই বলে ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা ভাল। তা তোমার কয়দিন ছুটী নষ্ট হয়। এখানে যে কয়দিন থাক, তাতেই আমাদের সুখ।

শেষে রামতনুর কলিকাতা যাওয়া স্থির হইল। ক্রমে কথাটা জগদ্ধাত্রী দেবী শুনিলেন। রামতনু শুনিল। রাম-তনুর সঙ্গীরাও শুনিল।

রামকৃষ্ণ এবং কেশবচন্দ্র জগদ্ধাত্রী দেবীর স্নেহাধিক্য সম্বন্ধে যতটা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা দেখা গেল না। অবশ্য পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে কোন্ মাতার না কষ্ট হয়? বিশেষতঃ পুত্র যখন প্রথম প্রবাসে যায়। জগদ্ধাত্রী দেবীর মনটা একটু ভার হইল! মুখখানি যেন ম্লান হইল। যাহা হউক তিনি বুদ্ধিমতী। মনের সে ভাব সামলাইয়া লইলেন। কর্ত্তাকে বলিলেন, তনুর আর এক বছর বাদে কেশবের সঙ্গে গেলে কেমন হইত; পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা। তা এখনও ত কেশবের আফিস খুলিতে কয় দিন দেরি আছে। ৩।৪ দিন থাকিতে যাত্রা করিলেই হইবে। আহা কেশব এটা খেতে ভালবাসে, ওটা খেতে ভালবাসে, কিন্তু পূজার গোলমালে কিছুই করে দিতে পারি নাই। তা এ দু চার দিন থাকিলে সব করে দি। এই ভাবে কয়েকটি কথা তিনি বলিলেন। শেষে কর্ত্তা যখন বলিলেন যে, "ত্রয়োদশী সর্ব্ব শুভা, ত্রয়োদশীর যাত্রা ভাল, তনু এই প্রথম বিদেশ যাইবে।" তখন তিনি মনকে বুঝাইলেন। মাতা তনুর যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে কেশবচন্দ্র এবং রামতনুর যে যে খাদ্য সামগ্রী প্রিয়, তাহা যথাসম্ভব প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। আহা মায়ের মন তাহাতেও তৃপ্ত হয় না।

রামতনুও এদিকে বন্ধুবর্গের সহিত সংক্ষেপে দেখা

সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইল এবং শীঘ্রই আবার দেখা হইবে এই আশা জানাইল।

যাত্রার দিন উপস্থিত। গৃহের মধ্যে যাত্রার ঘটস্থাপন হইয়াছে। দুই ভাই যথারীতি সেখানে বসিলেন। দুই জনের কপালে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে দধির ফোঁটা দেওয়া হইল। পূজার নির্ম্মাল্য এবং সিদ্ধি উত্তরীয়ের এক পার্শ্বে বাঁধা হইল। গৃহদেবতা শালগ্রাম শিলাকে প্রণাম করান হইল। পিতা মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনকে প্রণাম করিয়া "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া কেশবচন্দ্র এবং রামতনু যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণনগরের নীচেই খড়িয়া নদী। খড়িয়ার ঘাটে নৌকা তৈয়ারি ছিল। কেশবচন্দ্র ও রামতনু ঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন। একটু পরে রামকৃষ্ণ আসিলেন। কেশবচন্দ্র এবং রামতনু আবার পিতার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। এইবার দুটি ভাই নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ছাড়িল। রামকৃষ্ণের চোখ দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। নৌকার সঙ্গে তাঁহার মন চলিল। শূন্যমনে রামকৃষ্ণ গৃহে ফিরিলেন।

মাঝি মাল্লা নৌকা খুলিয়া দিল। ভরা ভাদ্রের পর নদীর জল বেশী কমে নাই। জল প্রায় কাণায় কাণায় রহিয়াছে। দাঁড় বাহিয়া নৌকা কিছু দূর চলিল। রামতনু ছইয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক দেখিতে লাগিল। ক্রমে শ্রান্ত হইয়া ভিতরে গিয়া বসিল। রামতনু পিতা মাতাকে ছাড়িয়া এই প্রথম বিদেশে যাইতেছে।

তাহার মুখখানি বিষণ্ণ, চোখ দুটি সজল দেখিয়া কেশবচন্দ্র স্নেহভরে কাছে ডাকিয়া লইলেন, ক্ষুধা পাইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। নানা উপায়ে তাহাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামতনুও মনকে বুঝাইতে লাগিল। ক্রমে নৌকা খড়িয়া ছাড়িয়া গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। পথে নৌকা স্বরূপগঞ্জ, নবদ্বীপ, কালনা, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে লাগান হইয়াছিল। শৌচ স্নান আহারের জন্য এই সকল স্থানে নৌকা বাঁধা আবশ্যক হইয়াছিল। এই প্রকার সুবন্দোবস্তে এবং নদীর তীরের গ্রাম নগরাদির দৃশ্যে রামতনু পথের কষ্ট তেমন বুঝিতে পারে নাই। ক্রমে নৌকা কলিকাতার গঙ্গায় আসিয়া পঁহুছিল। সেখানকার দৃশ্য দেখিয়া রামতনুর কতই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত গঙ্গা যেন তর-বিতর নৌকা, পানসী, ভাউলে, এবং জাহাজে পূর্ণ, রামতনু দাদাকে কৌতূহলের সহিত কত প্রশ্নই করিতে লাগিল। দাদাও সস্নেহে সযত্নে প্রত্যেক কথার জবাব দিতে লাগিলেন। নৌকা কলিকাতার গঙ্গায় অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলিল। ক্রমে নৌকা চেতলায় পঁহুছিল। কেশবচন্দ্র এবং রামতনু ঘাটে নামিলেন। মাল্লারা জিনিস পত্র উঠাইয়া লইল। কেশবচন্দ্র সকলকে লইয়া বাসায় পঁহুছিলেন।

কেশবচন্দ্র আফিস খুলিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে আসাতে বাসার পরিচারিকা—ঝি—বিশেষ আশ্চর্য্য হইল। যাহা

হউক সে যথারীতি গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল এবং বলিল, "দাদা ঠাকুর, সঙ্গে এ ছেলেটি কে ?" কেশবচন্দ্রের নিকট সব কথা শুনিয়া ঝি রামতনুকে অনেক মিষ্ট কথা বলিল। কত কি খাওয়াবে, কত কি দেখাবে, দাদার কাছে বেশ থাকিবে বলিয়া ঝি রামতনুকে আশা, ভরসা দিল।

ঝি কেশবচন্দ্রের ও রামতনুর আহারাদি বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক করিতে লাগিল। রামতনু বাসার চারিদিক তাকাইয়া দেখিল। তাহার নিকট সমস্তই নূতন বোধ হইতে লাগিল। এই সময় পিতা মাতার কথা, বাড়ীর কথা রামতনুর মনে হইল। রামতনু ভাবিল, কোথায় ছিলাম—কোথায় এলাম !

রামতনুর প্রথম প্রবাস এবং হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবেশ।

কয়েকদিন পরে আফিস, কাছারি খুলিল। কেশবচন্দ্র দশটার সময় আফিস যান আর পাঁচটার পর বাসায় ফিরেন। অনেক সময় তাঁহার বাসায় ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইত। ইহার প্রথম কারণ, আফিসের কাজের ভিড়, দ্বিতীয় কারণ লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ। কেশবচন্দ্র অনেক লোকের মোকদ্দমা মামলার তদ্বির তদারক করিতেন, তাহার জন্য তিনি কিছু কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যের জন্য দেখা সাক্ষাতের প্রায়ই আবশ্যক

হইত। এদিকে এই সুদীর্ঘকাল নবাগত রামতনুকে বাসায় একাকী অথবা ঝিয়ের কাছে থাকিতে হইত। চেতলায় সে সময়ে কোন স্কুল ছিল না। সুতরাং রামতনুকে বাসাতেই থাকিতে হইত। কিন্তু বাসায় ঐভাবে থাকা কেশবচন্দ্র আদৌ পছন্দ করিতেন না। কৃষ্ণনগরের কুসঙ্গ ছাড়াইয়া তিনি রামতনুকে সৎসঙ্গে রাখিবার তখন পর্য্যন্ত কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। এজন্য তাঁহার চিন্তা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব তাহা তিনি করিলেন। রামতনু পূর্ব্বে অল্প অল্প পারসী এবং ইংরাজী শিখিয়াছিল। কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যার পর রামতনুকে এই দুই বিষয় শিক্ষার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার হাতের লেখা ভাল করিবার জন্য দুপুর বেলায় লিখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইংরাজী এবং পারসী পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পাঠ, কয়েক পৃষ্ঠা ইংরাজী হস্তলিপি সমাপন করিতে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সময় লাগিত না। রামতনু অনেক অবসর পাইত। তাহার অনেক সময় নষ্ট হইতে লাগিল। বালকেরা স্বভাবতঃই অস্থির। একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। বালক রামতনু এ নিয়মের বাহিরে ছিল না। কিছুদিন পরে রামতনু যখন চেতলার পথ ঘাট চিনিল, তখন দাদার অনুপস্থিতিতে অবসর পাইলে বাহিরে যাইত। বাহিরে নানা দৃশ্য দেখিত, নানা কথা শুনিত। এই সকল দেখা শুনা নীতির হিসাবে

বড় প্রার্থনীয় ছিল না। চেতলা বাণিজ্যপ্রধান স্থান। চেতলার চাউলের হাট প্রসিদ্ধ। এই চাউল খরিদ বিক্রীর জন্য কত দেশের কত রকমের লোকের সমাগম হইত। ইহা ছাড়া চেতলা কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য সেখানে নানা শ্রেণীর তীর্থযাত্রী গমনাগমন করিত। এই সকল অস্থায়ী লোকজনের চালচলন কথাবার্ত্তা দেখিবার শুনিবার উপযুক্ত নহে। কেশবচন্দ্র এ সমস্ত কথা জানিতেন এবং বুঝিতেন। সুতরাং ছোট ভাইটিকে এরূপ স্থানে এইরূপভাবে অধিকদিন রাখা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিলেন এবং কি উপায়ে রামতনুকে এখান হইতে দূরে রাখিয়া তাহার লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত করিতে পারা যায়—তাহাই দিনরাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমরা প্রাণ মন দিয়া যাহা খুঁজি, অনেক সময়ই তাহা পাই। তাহা না হইলে পৃথিবী চলিত না। কেশবচন্দ্র রামতনুর সুশিক্ষার একটি ভাল বন্দোবস্ত করিবার সুযোগ পাইলেন। একদিন তাঁহাদের জেলার কালীশঙ্কর মৈত্র নামক একজন ভদ্রলোক কেশবচন্দ্রের বাসায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহার উদ্দেশ্য কেশবচন্দ্র ইঁহাকে কোন কাজ কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দেন। কাজকর্ম্মের কথার পর দুজনের আলাপ পরিচয় হইল। ক্রমে কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল যে, কালীশঙ্করের একজন নিকট আত্মীয় হেয়ার সাহেবের স্কুলের পণ্ডিত। আরও প্রকাশ পাইল যে, এই

পণ্ডিত, সাহেবের একজন প্রিয়পাত্র। পণ্ডিতের নাম গৌর-মোহন বিদ্যালঙ্কার। কেশবচন্দ্র এই আলাপের পর কালীশঙ্করের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলেন। স্বার্থ পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিল। কেশবচন্দ্র কালীশঙ্করের কাজকর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া বিশেষ আশা দিলেন। কালীশঙ্করও কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠের জন্য গৌর-মোহন্ বিদ্যালঙ্কারকে বিশেষ করিয়া বলিবেন—বলিলেন।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের চরিত্রে একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি কৌলীন্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভাবিতেন কুলীনগণ হীন অবস্থায় থাকিলেও তাহাদের জন্মগত, বংশগত মহত্ত্ব একবারে বিলুপ্ত হয় না। তিনি কুলীনের প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।

যদি হয়, তবে এমন বংশের বংশধরেরা কখনই এক-বারে নির্গুণ হইতে পারেন না। গোলাপ ফুলের পাপড়ার রং এবং রস শুকাইয়া গেলেও তাহাতে সদ্গন্ধ থাকে। কুলীন দরিদ্র হইলেও তাঁহার আচরণে কিছু না কিছু সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কালীশঙ্কর বিদ্যালঙ্কারের চরিত্রের বিশেষত্বটুকু অবগত ছিলেন। কেশবচন্দ্রেরা কুলীন। কেশবচন্দ্রের অবস্থা ভাল নয়। অথচ তাহার ভাইটির সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই বন্দোবস্তে

বিদ্যালঙ্কারের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। তিনি হেয়ার সাহেবকে এক কথা বলিয়া দিলেই গরীব ভদ্রসন্তানের বিশেষ সাহায্য হয়। এই সব কথা কালীশঙ্কর বিদ্যালঙ্কারকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। বিদ্যালঙ্কারের দয়া হইল। তিনি রামতনুকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন বলিলেন। কালীশঙ্করের মুখ রক্ষা হইল। যথাসময়ে তিনি এ কথা কেশবচন্দ্রকে জানাইলেন। কেশবচন্দ্র যেন হাতে চাঁদ পাইলেন।

ইহার পর একদিন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় রামতনুকে চেতলা হইতে কলিকাতায় আনাইলেন। বালকটিকে সহেবের বাসায় লইয়া যাইতে হইবে। সেখানে সাহেবকে বালকটিকে দেখাইয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে, নতুবা কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া বিদ্যালঙ্কার রামতনুকে লইয়া হেয়ার সাহেবের নিকটে গেলেন। হেয়ার সাহেব তখন গঙ্গার ধারে গ্রে সাহেবের বাড়ীতে থাকিতেন। বিদ্যালঙ্কার সেই থানেই গেলেন। তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন প্রাতে সাহেবকে একটু নিরিবিলিতে পাবেন, কিন্তু তাহা হইল না। সাহেব বড় দয়ালু। এ কথা সকলেই জানে। কাজেই তাঁহার বাড়ীতে সকালে বিকালে কৃপাভিখারীর ভিড় অল্প হইত না। কেহ কাজ কর্ম্মের আশায়, কেহ ছেলেকে বিনা মাহিনায় তাঁহার স্কুলে পড়াইবার জন্য, কেহ অন্য কোন রকম সাহা-

য্যের আশায় তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইত। এই সকল লোকের অনুরোধ উপরোধ অনেক সময় এত অধিক এবং অসঙ্গত হইত যে, হেয়ার সাহেবের মত দয়ালু দেবতুল্য লোকও বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। গৌর-মোহন পণ্ডিত যখন রামতনুর জন্য সুপারিশ করিতে গেলেন, তখন সাহেবকে খোস মেজাজে পান নাই। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রার্থনা সে যাত্রায় পূর্ণ হইল না।

বিদ্যালঙ্কার ইহাতে হতাশ হইলেন না। তিনি হেয়ার সাহেবের প্রকৃতি বেশ জানিতেন। স্নেহময়ী মাতার ক্রোধ ও বিরক্তির মত হেয়ার সাহেবের বিরক্তি স্থায়ী নহে। ইহা জানিয়া বিদ্যালঙ্কার রামতনুকে একটু বুঝাইলেন। পরে বলিলেন, "দেখ রামতনু, সাহেবকে ভাল করিয়া ধরিতে হইবে। দিন কতক সাহেবের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে পারিবে ?" রামতনু বলিল, "যে আজ্ঞা, তাতে আর কি ? পারবো বই কি ?" "আচ্ছা, তবে তুমি এখন আমার বাসায় চল। সেখানে থাকিবে। তোমার দাদাকে খবর দিব।" এই বলিয়া গৌর-মোহন রামতনুকে লইয়া তাঁহার হাতিবাগানের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

এখন কিছুদিন সাহেবের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ান রামতনুর কাজ হইল। বিদ্যালঙ্কারের বাসায় তাড়াতাড়ি আহার করিয়া, হেয়ার সাহেব কুঠি হইতে বাহির হইবার আগেই, তাঁহার ফটকের ধারে রামতনু উপস্থিত হইত।

সাহেব পাল্কীতে উঠেন, উড়ে বেহারাগণ "হিঁয়ো মারি সা'ব্ বড় ভারি" বলিতে বলিতে যত দ্রুতপদে যায়, রামতনুও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে থাকে। সাহেবের পাল্কী সহরের নানা স্থানে যাইত, কোথাও বা অল্পক্ষণ কোথাও বা অধিকক্ষণ থামিত। রামতনুও ছায়ার মত পাল্কীর সঙ্গে থাকিত। রামতনু কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ করে। ক্রমে রামতনুর দুঃখের শেষ হইয়া আসিল। ক্রমাগত দুই মাস এই ভাবে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে রামতনুকে দৌড়াইতে দেখিয়া সাহেব বুঝিলেন যে, এ ছেলে ছাড়িবার পাত্র নহে। লেখা পড়া শিখিবার জন্য ইহার আন্তরিক ইচ্ছা আছে। তখন তিনি এক দিন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে ডাকিয়া ছেলেটিকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সর্ত্ত করিতে বলিলেন। সর্ত্ত এই যে, বালকের অভিভাবক এই কথা লিখিয়া দিন যে তিনি বালককে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন। তখনকার বালকেরা এখনকার ছেলেদের মত এত ফিট-ফাট থাকিত না। তাহাদের অনেকের পায়ে জুতা থাকিত না। গায়ে কামিজ কোট থাকিত না। খালি পায়ে খালি গায়ে একখানি চাদর গলায় দিয়া তখনকার অধিকাংশ ছেলেই বিদ্যালয়ে আসিত। তাহাদের পায়ে ধূলা, গায়ে ময়লা এবং ঘামের গন্ধ। হেয়ার সাহেব এ সকল দেখিতে পারিতেন না। শুনা যায়, তিনি অনেক সময় স্কুলের ফটকের কাছে তোয়ালে হাতে করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকিতেন। অপরিষ্কার বালকদের তিনি গা মুছাইয়া দিতেন। যাক। রামতনুকে পরিষ্কার ভাবে স্কুলে পাঠান সম্বন্ধে সর্ত্ত লিখিয়া দিবার কথা কেশবচন্দ্রকে জানান হইল। কেশবচন্দ্র কি করিবেন, তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে কেশবচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তিনি স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি ত থাকি চেতলায়, তনু থাকিবে হাতীবাগানে। অপরের বাসায় থাকিয়া সে প্রতিদিন কেমন ভাবে স্কুলে যাইবে, তাহা জানিতে পারিব না, মন্দ হইলে তাহার প্রতীকারও সহজে করিতে পারিব না, তাহা হইলে কথার খেলাপ হইবে। সাহেব কি মনে করিবেন! আর কাজটাও ঠিক হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি নিরাশ হইয়া গৌরমোহনকে নিজের অসামর্থ্য জানাইলেন। গৌরমোহন প্রকৃত ব্যাপারটা কি তাহা জানিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মানে যে সৌখীন সাজ সজ্জা, তাহা তিনি কেশবচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন কেশবচন্দ্রের আশা ভরসা হইল। তিনি যথারীতি অঙ্গীকার-পত্র সহি করিয়া দিলেন। রামতনু স্কুলে অবৈতনিক ছাত্র হইয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইল। আজ রামতনুর কি আনন্দের দিন! যাহা হউক, বহু চেষ্টায় অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া রামতনুর সুশিক্ষার সূত্রপাত হইল। পড়ার ত বন্দোবস্ত হইল। এখন কলিকাতায় একটা থাকি-

বার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। চেতলা হইতে রোজ দুবেলা পটলডাঙ্গা যাওয়া আসা সহজ কথা নহে। যদি সহজ হইত, তবে ত কোন চিন্তার কারণই ছিল না। সকল দিকে সুবিধা হইত। সেকালে ত এমন সুলভ ট্রাম ছিল না। আর থাকিলেও তাহার খরচ রামতনুর অবস্থার অতিরিক্ত হইত।

যাহা হউক, কেশবচন্দ্র অনেক অনুরোধ উপরোধ করাতে বিদ্যালঙ্কার তাঁহার বাসায় রামতনুকে রাখিতে সম্মত হইলেন। রামতনু কলিকাতায় হাতীবাগানে বিদ্যালঙ্কারের বাসায় থাকিয়া স্কুল সোসাইটীর স্কুলে অবৈতনিক ছাত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

রামতনুর ছাত্রজীবন।

স্কুল সোসাইটীর স্কুলে—

রামতনু ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। কলিকাতা আসিয়া ভাল স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াও প্রথমে রামতনুর শিক্ষার তেমন সুবিধা হয় নাই। সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষা এদেশে অল্পে অল্পে বিস্তারিত হইতেছিল। এখনকার মত, স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা নিম্নশ্রেণীর বালকদের শিক্ষায় অনেক সাহায্য করিত। এই সকল সর্দ্দার পোড়োর নাম মনিটর। রামতনুদের ক্লাসে দুই জন মনিটর ছিল। তাহাদের এক জনের নাম আদিত্য-

রজক। পাঠশালার সর্দ্দার পড়োর মত ইহারাও ছেলেদের উপর অত্যাচার করিত; অনেক সময় সামান্য ক্রটীতে অত্যন্ত প্রহার করিত, কিন্তু সন্দেশ মিঠাই অথবা নগদ কিঞ্চিৎ দিলে অব্যাহতি দিত। সে যাহা হউক, রামতনু বিদেশে আসিয়া নূতন স্কুলে যথাসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিতে লাগিল।

রামতনু কায়মনে চেষ্টা করিয়া পড়াশুনা করিলেও, তাহার পড়াশুনা ঠিক মনের মত হইতে লাগিল না। ইহার প্রধান কারণ তাহার বাসার অসুবিধা। একটা কথা আছে 'পর ভাতী' বরং ভাল কিন্তু 'পর ঘরী' ভাল নয়। কথাটা ঠিক। পরের বাসার থাকিয়া পড়াশুনার অনেক অসুবিধা হইতে লাগিল। অবশ্য প্রথমে এই পরের বাসায় আশ্রয় পাইবার জন্য এক দিন কেশবচন্দ্র ও রামতনুকে লালায়িত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাঁহারা ভাবেন নাই যে এত অসুবিধা হইবে। এই বাসার প্রথম অসুবিধা ছিল স্থানের অভাব। দ্বিতীয়, অনেক নিষ্কর্ম্মা অসৎ চরিত্র লোকের বাস এবং সমাগম। তৃতীয়, রামতনু বয়সে বালক হওয়ার জন্য অনেক কাজে তাহার বেগার লওয়া। বিদ্যালঙ্কারের বাসাটি ছোট ছিল। তাহার উপর সেখানে অনেক লোক থাকিত। সুতরাং স্থানাভাব হওয়া বিচিত্র নহে। আর এই জন্যই বোধ হয় বিদ্যালঙ্কার প্রথমে বাসায় স্থান দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। সেকালে লোকে

বিদেশে পরিবার লইয়া প্রায় বাস করিত না। অবস্থা ভাল হইলে লোকে নিজে বাসা করিতেন, অন্যথা দু চারি জন মিলিয়া বাসা করিতেন। কলিকাতায় বা জেলার সদরে এই প্রকার বাসা তখন অনেক ছিল। সেই সকল বাসায় গ্রামের লোক মোকদ্দমা মামলা উপলক্ষে হউক, অন্য প্রকার বিষয় কার্য্যে হউক, চাকুরীর প্রত্যাশায় উমেদারী করিবার জন্য হউক আসিয়া আশ্রয় লইত। অনেক বাসায় বিদ্যার্থী বালকও থাকিত। গ্রামের লোককে. আত্মীয় পরিচিত জনকে এই ভাবে আশ্রয় দেওয়া তখনকার একটা প্রথা ছিল। দিলে প্রশংসা হইত, না দিলে অপযশ হইত। এই প্রথার মূলে অতি মহৎ ভাব ছিল। কিন্তু পরে ইহার অপ-ব্যবহার হয়। এই গুলি নিষ্কর্ম্মা লোকের আড্ডায় পরিণত হয়। গৌরমোহনের বাসাও তাহাই হইয়াছিল। তাহার উপর গৌরমোহন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার হইলেও, তাঁহার কোন বিষয়ে তেমন নিষ্ঠা ছিল না। তৎকাল-সুলভ পাপ-প্রলোভনে তাঁহার অরুচি ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও তিনি কেবল নস্যতে তৃপ্ত হইতেন না। সুতরাং তাঁহার বাসায় অন্য বাসারও অনেকে আমোদ আহ্লাদের জন্য আসিত। কথাবার্ত্তা যে ভাবে, যে সকল প্রসঙ্গে হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। স্থান অল্প, কাজেই সেই সকল বৈঠকের মধ্যে রামতনুকে এক কোণে বই লইয়া বসিতে হইত, এবং সময় সময় ফায়-ফরমাসটা তামিল করিতে

হইত। বাসায় ত দাস দাসী বা পাচক থাকিত না। সুতরাং বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ এক গ্লাস জল দিতে বলিলে তাহা দিতে হইত। টিকেখানাও ধরাইয়া দিতে হইত—আবশ্যক হইলে রাঁধিতেও হইত।

তাড়নায় বালক অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক ভাগ্যে ভাগ্যে অল্পদিনের মধ্যে এ সকল দুঃখ-বিড়ম্বনার হাত হইতে বালক উদ্ধার পাইল। আত্মীয় খাঁ মহাশয়ের বাসায় ভোজন, শয়ন ও অধ্যয়নের সুবিধা, তাহার উপর তাঁহার গুণবতী গৃহিণীর স্নেহ যত্নে রামতনু পূর্ব্বের কষ্টের কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন আবার সহপাঠী দিগম্বরের মাতার আদর যত্ন পাইতে লাগিলেন, তখন এইরূপ স্থানে থাকিয়া পড়া শুনার সুবিধা কতদূর হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিছু দিন এই ভাবে চলিল। ক্রমে সকল কথা কেশবচন্দ্রের কাণে গেল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই কেশবচন্দ্র রামতনুকে ভাল বাসায় রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন। এখন আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মান অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের এক আত্মীয়ের দ্বারস্থ হইলেন।

শ্যামপুকুরে তাঁহাদের পিতার মামাতো ভাই রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের সহিত কেশবচন্দ্র দেখা করিলেন। নদীয়া জেলায় তখন অনেক নীলের কুঠী ছিল। সেখানে বহু পরিমাণে নীল হইত। এই নীলের কারবারের তিনি এক জন দালাল

ছিলেন। রামকান্ত খাঁ মহাশয় শ্যামপুকুরে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি কেশবচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া যথারীতি মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন ও বলিলেন, "আমি যখন এখানে আছি জান, তখন আমার কাছে আগে আসা উচিত ছিল। আমি ত আর পর নই।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের পিতা রামকৃষ্ণের উপরও তিনি একটু অনুযোগ করিলেন। যাহা হউক, শেষে রামতনু তাঁহার বাসায় থাকিবে স্থির হইল। কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠের দুধ ও জলখাবারের খরচ দিবেন বলিলেন। রামতনু শ্যামপুকুরের বাসায় আসিল।

খাঁ মহাশয় সপরিবারে শ্যামপুকুরে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহার বাসা যে, সকল বিষয়ে বিদ্যালঙ্কারের আড্ডা হইতে ভাল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যেখানে সুদক্ষা গৃহিণী থাকেন, সেখানে সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা দেখা যায়। সে বাড়ীর সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুরুষদের বাসার মত, ঘরের কোণে কোণে পানের পিক, তক্তাপোষের নীচে জলখাবারের ঠোঙা, আরশোলার বাসা, তাহার পায়ায় তামাক টিকের দাগ, পাশে তামাকের গুল, উপরে দেড় ইঞ্চ পুরু ধূলার উপর ছেঁড়া মাদুর, মশারির চালের উপর ঝুল, ছেঁড়া পৈতা, কাপড়ের পাড়, উঠানে আবর্জ্জনা, কুঁয়াতলায় শেওলা কাদা, জলের জালার কাছে তিনটা ভাঙ্গা ভাঁড় দেখিতে পাওয়া যায় না। খাঁ মহাশয়ের বাসায় আসিয়া রামতনু বিদ্যালঙ্কারের বাসা এবং এই

বাসার পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারিল। এ বাসায় রামতনুর প্রধান সুখের বিষয় হইল খাঁ মহাশয়ের গৃহিণীর স্নেহ এবং তৈয়ারি অন্ন ব্যঞ্জন। বালক পাকশালার পরিশ্রম এবং সুঁদরী কাঠের ধূম হইতে অব্যাহতি পাইয়া যেন নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। সে এখন যথেষ্ট সময় পাইয়া মনের সাধে লেখাপড়া করিতে লাগিল। ইহার ফল বিদ্যালয়েও দেখা যাইতে লাগিল। প্রশংসা এবং শিক্ষকগণের স্নেহে তাহা প্রকাশ পাইল। হেয়ার সাহেবের স্নেহদৃষ্টি, পূর্ব্ব হইতেই ছিল এবং তাহা বাড়িতে লাগিল।

এই সময়ে রামতনুর জীবনে আরও একটি সুখলাভ হয়। যে দিন রামতনু প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হয়, সে দিন তাহার সঙ্গে সেই শ্রেণীতে আর একটি বালক ভর্ত্তি হয়। বালকটির নাম দিগম্বর মিত্র। দিগম্বরের অবস্থা রামতনুর অপেক্ষা ভাল ছিল। দিগম্বরদের বাড়ী কোন্নগর। কিন্তু তাঁহার পিতা শিবচরণ মিত্র কলিকাতায় গিল্‌বরণ কোম্পানীর অধীনে গুদামে সরকারের কাজ করিতেন। তাঁহার পিতামহও কোন সাহেব কোম্পানীর অধীনে কাজ করিতেন। দিগম্বরের পিতৃপিতামহের অবস্থা ধনী বড়লোকের মত না হইলেও বেশ সম্পন্ন ছিল। তাঁহারা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশ সঞ্চয় করিয়া কোম্পানীর কাগজ কিনিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। উপার্জ্জিত অর্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অতিথি সজ্জনের

সেবায় খরচ হইত। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যায়, দিগম্বর কেমন ঘরের ছেলে। দিগম্বর নিজেও বড় ভাল ছেলে ছিল। অল্পদিনের মধ্যে রামতনু এবং দিগম্বরের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ক্রমে তাহা বন্ধুতায় পরিণত হয়। দিগম্বরদের বাড়ী শোভাবাজারে ছিল। রামতনু প্রথমে যখন গৌরমোহনের হাতীবাগানের বাসায় থাকিত, তখন স্কুলের পর দিগম্বরের সহিত আর দেখা হইত না। কিন্তু শ্যামপুকুরে আসার পর হইতে রামতনুর অবসর বেশী থাকাতে আর বাড়ীর অনেকটা কাছে হওয়াতে রামতনু প্রায়ই দিগম্বরের বাড়ী যাইত। দিগম্বরদের বাড়ীতে দুই বন্ধুতে স্কুলের পড়া শুনারই বেশ আলোচনা করিত। রামতনুর স্বভাব চরিত্র দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া দিগম্বরদের বাড়ীর সকলে তাহার প্রশংসা করিতেন। ক্রমে রামতনু দিগম্বরদের বাড়ীর ভিতর যাইত। সেখানে দিগম্বরের মাতা তাহাকে বিশেষ আদর যত্ন করিতেন, প্রায়ই তাহাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। দিগম্বরের জননী রামতনুকে আপনার পুত্রের মত ভালবাসিতেন, রামতনুও তাঁহাকে জননীর মত দেখিতেন।

কৃষ্ণনগরে পিতামাতার নিকট হইতে আসিয়া, তাঁহাদের স্নেহ যত্ন হইতে দূরে থাকিয়া প্রথমে রামতনুর যে কষ্ট হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর দাদার কাছে চেতলায় বসিতে না বসিতে তাহাকে কলিকাতায় সম্পূর্ণ

এক অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকদের সহিত থাকিতে হইল। তাহাও না হয় কোনরূপে সহ্য হইত, কিন্তু সেখানে নানা উৎপাত বালকের অসহ্য হইতে লাগিল। সর্ব্বদা হাসির গড়্‌রা, তামাক গাঞ্জা চরসের ধূম, পাকশালার ধূম ও পরিশ্রম, বয়োজ্যেষ্ঠগণের ফায়-ফরমাস হইতে রেহাই পাইয়া অজ্ঞাতসারে রামতনুর হৃদয়ে, মনে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল। রামতনু বিশেষ যত্ন পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল। এই প্রকারে, পরিশ্রমে যে বিমল আনন্দ তাহা বালক লাভ করিল। আর হেয়ার সাহেবের দয়া এবং এই দুই মাতৃস্থানীয়া মহিলার অকৃত্রিম স্নেহ যত্নের কথা স্মরণ করিয়া সেই ভাবপ্রকট বালকের হৃদয় কৃতজ্ঞ-তায় পূর্ণ হইতে লাগিল। অভাবে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। অভাব নহিলে মানব বস্তুর মূল্য মর্য্যাদা বা তাহার উপ-কারিতা সম্যক বুঝিতে পারে না। প্রবাসে পিতা মাতার স্নেহ যত্নের অভাব বালক রামতনুর বড়ই তীব্র বোধ হইয়া-ছিল। কিন্তু বালকের সৌভাগ্যবলেই হউক আর তাহার পিতৃ-মাতৃ-পুণ্য-বলেই হউক, এখন সে হেয়ার সাহেবের দয়া, এবং এই দুইটি রমণী-রত্নের স্নেহ লাভ করিয়া মানব-প্রকৃতির দুই প্রধান সদ্‌গুণের পরিচয় পাইল, তাহাদের মূল্য মর্য্যাদা এবং উপকারিতা ভাল করিয়া বুঝিল এবং ইহা দ্বারা কি শিক্ষা পাইল, হৃদয়ের ভাবের স্রোত কোন দিকে ফিরিল তাহাও দেখিতে পাইল।

রামতনুর শিক্ষা।

হিন্দুকলেজে

এবং

তৎকালীন সমাজ।

বাসার সুবিধা হওয়াতে রামতনু পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল। স্কুল সোসাইটীর স্কুলে যতদূর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বালক পাইল। ১৮২৬ সালে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ১৮২৮ সালে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া রামতনু হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইল। এখানেও রামতনুকে কলেজের মাহিনা দিতে হইত না। এখন স্কুল এবং কলেজ বলিলে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে, সেকালে তাহা বুঝাইত না। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে স্কুলে এণ্ট্রান্স বা (ম্যাট্রিক্যুলেশন) এবং কলেজে ফাষ্ট-আর্টস (বর্ত্তমান ইণ্টারমিডিয়েট) বি, এ, এম, এ; প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সে কালে দুইটি বিভাগ ছিল। জুনিয়র এবং সিনিয়র ডিপার্টমেণ্ট। সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য দেখিলে বুঝা যায় যে, উহা বর্ত্তমান সময়ের বি, এ, পরীক্ষার পাঠ্যের অপেক্ষা কম নহে। যাহা হউক, রামতনু এখন হিন্দুকলেজের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। রামতনুর সহপাঠী বন্ধু দিগ-

স্বরও ৪র্থ শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইল। ইহারা যখন হিন্দু-কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইল, তখন হেনরি ডিভিয়ান ডিরোজিও নামক একজন ফিরিঙ্গী যুবক ৪র্থ শ্রেণীতে ইংরাজী-সাহিত্যের এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে হিন্দুকলেজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অনেকগুলি যুবক পাঠ করিতেন। ইঁহারা উত্তর কালে দেশে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিওর শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষ নূতনত্ব ছিল। তিনি ছাত্রগণকে পাঠ্য পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পাঠের ব্যাখ্যা, শব্দের অর্থ, বাক্যের বিশ্লেষণ ইত্যাদি করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না। যাহাতে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয় এবং মনের ভাব ও বৃত্তিগুলি উত্তমরূপে বিকাশ পায়, স্বাধীন ভাবে কোন কথার বিচার করিতে পারে এবং জটিল প্রশ্নের সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে, বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে, ছাত্র-গণকে লইয়া, বিতর্ক-সভা Debating club করিতেন। সেখানে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। ধর্ম্মনীতি, রাজ-নীতি, সমাজনীতি বিষয়ক রচনা পাঠ করা হইত এবং সে সকল বিষয় সম্বন্ধে পরস্পরের স্বাধীন মত প্রকাশ করা হইত। শেষে ডিরোজিও নিজের মত প্রকাশ করিতেন।

এই প্রকারে ডিরোজিওর ছাত্রগণের মনে তৎকাল-প্রচলিত নানা প্রকার সামাজিক প্রথার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। সমাজ-সৌধের ধ্বংস কার্য্যের-সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় চারি দিকে তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে হিন্দুর পৌত্তলিকতাকে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ যেমন আক্রমণ করিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায়ও তেমনই তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন। এ সমস্ত ত প্রকাশ্য ভাবে হইতেছিল। স্কুলের ক্ষুদ্র গৃহেও পৌত্তলিকতার বিপক্ষে কম আন্দোলন হয় নাই। এমন অবস্থায় যুবকগণ যে পুরাতন ধর্ম্মদ্রোহী হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এই সকল আন্দোলনের ফল প্রকাশ হইতে বড় বিলম্ব হইল না। তৎকালীন নব্য যুবকদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ্য আদালতে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, I do not believe in the sacredness of the Ganges. অর্থাৎ গঙ্গার পবিত্রতায় আমি বিশ্বাস করি না। এই সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ স্তম্ভিত হইলেন। এই সময় সতীদাহ নিবারণের আইন প্রচলিত হইল। যুবকগণ দেখিলেন, হিন্দুকুপ্রথা দমনের জন্য রাজশক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা হইল। যদিও হিন্দুর পুরাতন আচার ব্যবহার রীতি নীতি রক্ষার জন্য রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল প্রভৃতি তখন-

কার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তেমন সুফল হয় নাই। বাহিরে ত এই প্রকার ধর্ম্ম এবং সমাজ-বিপ্লবের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, ভিতরেও বিপ্লবের কার্য্য বেশ চলিতেছিল। কলেজের যুবকগণ চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিতেন। এ সকল বিষয়ে ডিরোজিওর ছাত্রগণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে moral courage বা নৈতিক সাহস যথেষ্ট ছিল। তাঁহাদের সত্য-নিষ্ঠা প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত ছিল। "College boy was a synonym for *truth*" কিন্তু বুঝিবার দোষে তাঁহারা এই সদ্গুণের অপব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে সুরাপান, অখাদ্য ভোজন এবং হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করা সৎসাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং কার্য্যতঃ তাহাই করিতেন। সেই সমাজ-বিপ্লবের দিনে শিক্ষিত যুবকগণ সুরাপানকে কি ভাবে দেখিতেন, তাহা পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত

হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় সুরাপান শিক্ষা দিবার একজন গুরু ছিলেন। তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রাতে দেশীয় প্রথা অনুসারে আসন বা পীঁড়িতে বসিয়া মাছ ভাত খাইতেন, রাত্রে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবেলে বসিয়া ইংরাজী রীতিতে খানা খাইতেন"।

নিষিদ্ধ মাংস ভোজন সম্বন্ধে শুনা যায়, তখনকার এই শ্রেণীর যুবকগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিরক্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "আমরা গোরু খাই গো, আমরা গোরু খাই। তাঁহাদিগকে দেখাইয়া 'টিকা' মুখে ধরিয়া বলা হইত, "আমরা মুসলমানের জল মুখে দিতেছি।" মুসলমানের রুটি মাংস প্রভৃতি খাওয়া সংসাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কলেজের যুবক সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় তখনকার হিন্দু-সমাজে কি প্রকার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতেছিল। যুবক রামতনু কলিকাতায় এই প্রকার প্রভাব এবং পরিবর্ত্তনের মধ্যে শিক্ষা পাইতে লাগিল। রামতনুর মনের মধ্যে এই প্রভাব কার্য্য করিতেছিল। রামতনুর মত অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

কি ভাবে ধীরে ধীরে রামতনুর মধ্যে পরিবর্ত্তনের কার্য্য হইতেছিল, তাহা তাহার জীবনের তিনটি ঘটনা আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রথম ঘটনা ১৮২৬ সালে। রামতনু এক দিন হেয়ার সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে

দাঁড়াইয়া ছিল। হেয়ার সাহেব পাল্কী হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি শুষ্ক কেন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার সে দিন আহার হয় নাই অনুমান করিয়া তাহাকে আহার করিবার জন্য বলিলেন। রামতনু ব্রাহ্মণ-সন্তান, সাহেব তাহাকে আহারের কথা বলাতে সে বিষম মুস্কিলে পড়িল। সাহেবের সংস্পর্শে আহার করিলে জাতিপাত হইবে এই ভাবিয়া কতই আকুল হইয়াছিল। দ্বিতীয় ঘটনা, ছাত্র-বৎসল ডিরোজিওর বাড়ী রসিককৃষ্ণ, কৃষ্ণ-মোহন, দক্ষিণারঞ্জন, রামতনু প্রভৃতি উপস্থিত। ছাত্র-দের জন্য টিফিন আসিল। রামতনুকে চা খাইতে বলা হইল। রামতনু চা খাইল না। দক্ষিণারঞ্জন পীড়াপীড়ি করিল, রামতনু চীৎকার করিবার চেষ্টা পাইল। আপত্তি, খ্রীষ্টানের বাড়ী পান ভোজন করিলে জাতি যাইবে।

তৃতীয় ঘটনা। ইহা রেভারেণ্ড হাউএর বাড়ীতে। সে দিনও দক্ষিণারঞ্জন উপস্থিত। কুমারী হাউ ছাত্রগণকে সুরার পাত্র দিতেছেন। ক্রমে সুরাপাত্র রামতনুর নিকট আসিল। রামতনু স্তম্ভিত হইল। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন দক্ষিণারঞ্জন রামতনুকে বলিল, "তনু, কর কি, একজন লেডী তোমাকে ইহা দিতেছেন, আর তুমি কি না তাহা লইতেছ না, তুমি কি অসভ্য! সুসভ্য সমাজে এমন কাজ করিতে নাই।" দক্ষিণারঞ্জনের এই পরামর্শে রামতনু মদ্যপাত্র গ্রহণ করিল।

ডিরোজিওর শিক্ষায় যেমন একদিকে ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপর দিকে, তেমনই একাডেমিক এসোসিয়েসনের শিক্ষায় প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজের বহুবিষয়ে রামতনুর সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ক্রমে তাহা অবিশ্বাসে পরিণত হইল। শেষে বন্ধুগণের দৃষ্টান্তে, উৎসাহে ও পরামর্শে রামতনু সমাজবন্ধনের একটি গ্রন্থি আজ কাটিল।

কলিকাতার কলেজের এবং সুহৃৎ-সমাজের শিক্ষার প্রভাবে যদিও রামতনুর ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে অনেক মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা চালিত হইয়া তিনি পুরাতন ধর্ম্ম এবং সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই। ইহা তাঁহার পিতামাতার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কালেজের এই পঠদ্দশায়, পিতামাতার ইচ্ছানুসারে রামতনুর বিবাহ হইল। এই বিবাহের পর রামতনু আরও দুই তিন বৎসর হিন্দু কলেজে পড়িয়াছিল। শেষে প্রথম শ্রেণীতে এক বৎসর পাঠ করিয়া রামতনু সিনিয়র স্কলার্সিপ-প্রার্থী হয়। বৃত্তির জন্য বিশেষ পরীক্ষা হইত। হেয়ার সাহেব রামতনুকে এই পরীক্ষার জন্য টাঁকশালের অধ্যক্ষ, শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক (Secretary to the Commitee, of Public Instruction) ডাক্তার উইলসনের নিকট পাঠাইলেন। ডাক্তার উইলসন রামতনুকে তাঁহার সহকারী জেমস প্রিন্সেপের নিকট পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে

আদেশ করিলেন। পরীক্ষা হইল। রামতনু প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইল। হেয়ার সাহেবের অনুগ্রহে আরব্ধ শিক্ষা তাঁহারই অনুগ্রহে এবং রামতনুর একান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে এই ভাবে সমাপ্ত হইল।

কলিকাতায় কর্ম্মজীবন।

প্রথম অবস্থা।

১৮৩৩ সাল। হিন্দু কলেজ কমিটী তাঁহাদের সুযোগ্য কৃতবিদ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীকে কলেজের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। প্রথমে তাঁহার বেতন ত্রিশ টাকা ধার্য্য হইল। ত্রিশ টাকা বেতনের কথায় প্রাতস্মরণীয় কর্ম্মবীর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাকরীর প্রথম বেতনের কথা মনে হয়। প্রথমে তাঁহার ৪০৲ বেতন হয়। চল্লিশ টাকা বেতন পাইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন "এত টাকা কি করিব"। এরূপ মনের ভাব হওয়া বিচিত্র নহে। ছাত্রজীবনে দারুণ অসচ্ছলতার পর স্বোপার্জ্জিত টাকাগুলি দেখিলে প্রাচুর্য্যের ভাব স্বতঃই মনে আসে। রামতনু বাবুর মনে নিশ্চয়ই এই প্রকার সন্তোষ এবং আনন্দের ভাব আসিয়াছিল। তাঁহার পিতামাতাও ইহাতে বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় এখন তাঁহাদের দুটি পুত্র কৃতী হইলেন। কেশবচন্দ্র এবং রামতনু উভয়েই

উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনগরের বাটীতে সাধু রামকৃষ্ণ ও সাধ্বী জগদ্ধাত্রী পুত্রদ্বয়ের উপার্জ্জিত অর্থে সচ্ছলতার মুখ দেখিয়া বড়ই সুখী। রোপিত বৃক্ষের প্রথম ফল আস্বাদনে কি নির্ম্মল আনন্দ, তাহা যিনি ভোগ করিয়াছেন, তিনিই জানেন।

পরম ভাগবত, সাধু রামকৃষ্ণের পরিবার তাঁহার আদর্শের অনুরূপ হইল। বাল্যে পিতার নিকট চাণক্য-চিত্রিত সুখী পরিবারের বর্ণনায় তিনি শুনিয়াছিলেন—

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥

এখন ভগবানের কৃপায় তিনি এই স্বর্গসুখের অধিকারী। অধিকন্তু এখন আর তাঁহার অভাব নাই। কেশবচন্দ্রের পিতৃমাতৃভক্তির কথা আর কি বলিব? কেশবচন্দ্র প্রবাসে পিতার পত্র পাইলে অগ্রে তাহা শিরে ধারণ করিতেন। মাতার চরণ তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিতেন। রামতনু পিতৃমাতৃভক্ত। জগদ্ধাত্রী দেবীর গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। একেই এই সুখী দম্পতী স্বল্পে সন্তুষ্ট, তাহার উপর, ভগবানের কৃপায় এখন দুই পুত্রের আয়ে তাঁহাদের অভাব নাই। সুতরাং এখন রামকৃষ্ণ আদর্শ-গৃহী। তিনি মহীতলে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন। লাহিড়ী পরিবারের বোধ হয় এই সময়টি নির্ম্মল সুখের দিন ছিল।

রামতনু বাবুর হিন্দুকলেজে চাকরী হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার ছোট ভাই দুটিকে কলিকাতায় ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার জন্য আনেন। যখন রাধাবিলাস এবং কালীচরণকে কলিকাতায় আনা হয়, তখন রামতনু বাবুর ভরসা ছিল, তাঁহার বৃত্তির ষোলটি টাকা। ইহার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় আনিতে সাহস করেন। কলিকাতায় থাকার খরচ অবশ্য এখনকার সময় হইতে তখন অনেক সুলভ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিন জনের ১৬ টাকায় খুবই কষ্ট হইত। এখনকার ছাত্রদের মত সুখান্বেষী হইলে, ভাই দুটিকে লইয়া রামতনুর কলিকাতায় বাস অসম্ভব হইত। ঠনঠনিয়ার একটা বাড়ীর এক ঘরে ইঁহারা থাকিতেন। চাকর বা পাচক ছিল না। সমস্ত কাজ আপনাদের করিতে হইত। রান্না, বাটনাবাটা, কুটনাকোটা, জল আনা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া—সমস্তই নিজেদের করিতে হইত। তবে একজনকে এককাজ নিত্য করিতে হইত না। প্রত্যেকের পালা ছিল। এই ভাবে চালানতে খরচ কম হইত। আর এক কথা, তখন কাপড় চোপড়েরও এত পারিপাট্য ছিল না। রাধাবিলাস এবং কালীচরণ খালিপায়ে, উড়নী গলায় দিয়া বিদ্যালয়ে যাইত। এখন সে দিনের কথা 'কাহিনী' বলিয়া বোধ হয়। এখন একটি ছেলেকে কলিকাতায় পড়াইতে হইলে, ন্যূনকল্পে ত্রিশ টাকা লাগে।

"বাসার খরচ মাসে ত্রিশ,
এর কমে হয় না বলে গিরিশ"

এখন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, রামতনু বাবুর চাকরী হওয়াতে আর তেমন টানাটানি ছিল না। তবে তখনও তাঁহারা বাসার সকল কাজ আপনারাই করিতেন। রামতনু বাবু যখন এই ভাবে ভাই দুইটিকে লইয়া বাসা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার বাসায় অতিরিক্ত দুই এক জন লোক প্রায়ই থাকিতেন। স্বনামধন্য শ্যামাচরণ সরকার প্রথমে এই বাসায় আসিয়া আশ্রয় পান। সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় এক সময় এই বাসায় আসিয়া কিছু দিন থাকেন। আপনাদের কষ্ট হইলেও, রামতনু বাবু অপরের উপকার করিতে বিরত হইতেন না।

এই বাসায় অবস্থান-কালে তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁহার কনিষ্ঠ কালীচরণ তখন নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের ছাত্র। একবার পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে কালীচরণের দারুণ চক্ষুর পীড়া হয়। পরীক্ষা না দিতে পারিলে মহা অনিষ্ট হইবে। কালী-কালীচরণ ত ভাবিয়া আকুল। কিন্তু রামতনু বাবু কালীচরণকে অভয় দিলেন। তিনি কনিষ্ঠের রোগের সেবা যেমন করিতে লাগিলেন, তেমনই তাঁহার পড়ারও ব্যবস্থা করিলেন। রামতনু বাবু কলেজের কয়েক ঘণ্টা বাদে অধিকাংশ সময় কালীচরণের নিকট বসিয়া তাঁহার পাঠ্য পুস্তক-

গুলি পড়িয়া যাইতেন, কালীচরণ মনোযোগ দিয়া তাহা শুনিয়া শুনিয়া অভ্যাস করিতেন। এই ভাবে সে বার পাঠের ব্যবস্থা করাতে, কালীচরণ, চক্ষুর পীড়া হইলেও, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।

রামতনু বাবুর কর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। কর্ত্তব্য কর্ম্মে কখনও তাঁহার শৈথিল্য, অমনোযোগ বা ঔদাসীন্য দেখা যায় নাই। এই নিষ্ঠাই তাঁহার চারিত্র্য-মাহাত্ম্যের অন্যতম রহস্য। বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায়, বাসায় আশ্রিতগণের প্রতি ব্যবহারে তাঁহার সমান যত্ন ও নিষ্ঠা দেখা যায়।

সুহৃৎ সমাজে।

রামতনু বাবু কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কি ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তাহার আংশিক চিত্র পূর্ব্ব-অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে তাঁহার তখনকার সাধারণ শিক্ষিত যুবকের সহিত খুব বিশেষ একটা প্রভেদ ছিল না। সাধারণ শিক্ষিত যুবকেরা, কি সেকালের আর, কি একালের, লেখাপড়া শেষ করিয়া, বিষয়কর্ম্ম করিয়া থাকেন, অর্থ উপার্জ্জন করেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পালন করেন, অবসরকালে আমোদ আহ্লাদ করেন—এই ভাবেই দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। এই ভাবে তাঁহারা জীবন-স্রোতের সহিত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, যখন যাহা আসে,

তখন তাহা গ্রহণ করিয়া, কখন উল্লসিত, কখন অবসন্ন হইয়া জীবনযাপন করেন। কিন্তু রামতনু বাবু এবং তাঁহার কয়েক জন অন্তরঙ্গ সুহৃদের প্রকৃতি ভিন্নরূপ ছিল। রামতনু বাবু এবং হিন্দুকালেজের সুহৃদ্গণ প্রায় সকলেই ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহারই উপদেশে তাঁহারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। জ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহা ডিরোজিওর নিকটই শিখিয়াছিলেন। কলেজে ছাত্র অবস্থায় সে সকল কর্ত্তব্য তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে এবং অভিকাবকগণের তাড়নায় পূর্ণ মাত্রায় সম্পাদন করিতে পারেন নাই। এখন সেই ছাত্রগণ কৃতী যুবক। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চিন্তায় এবং কার্য্যে তাঁহারা স্বাধীনতা-প্রয়াসী ছিলেন। ধর্ম্ম এবং সমাজের মঙ্গল করিতে হইলে নিজে উন্নত হইতে হয়, আর নিজের সেই উন্নতির মূলে যে জ্ঞান এবং চরিত্রের উন্নতি আবশ্যক, তাহা রামতনু বাবু এবং তাঁহার সুহৃদ্গণ বেশ বুঝিতেন। তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে বিশেষতঃ রামতনু বাবুর চরিত্রে একটি বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষত্ব মহত্ত্বের প্রতিশব্দমাত্র। জ্ঞানযোগী কার্‌লাইলের মত ইঁহারা "সরলতা সকল ধর্ম্মের মূল" বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণের পান-ভোজনে, আচারে ব্যবহারে যে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তাহা যদি কেহ বিশেষভাবে বিশ্লেষ

করিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের সেই সকল কার্য্যের মূলে 'সরলতা সকল ধর্ম্মের মূল' এই ভাব বিদ্যমান। আজ আমরা যাঁহার চরিতামৃত শুনিতেছি, সেই মহাত্মা এই সরলতার অবতার ছিলেন। আর এই সরলতা সেই সুহৃদ্-মণ্ডলীর সঙ্গে থাকিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই যুবক-মণ্ডলীর জ্ঞানতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কলেজে তাঁহারা যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হয় নাই, অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাস্তবিক শিক্ষার ইহা অন্যতম উদ্দেশ্য। ইঁহারা এক সময় Epistolary Association পত্র ব্যবহার সভা স্থাপন করেন। ইহার পর ইঁহারা আর একটি সভাস্থাপন করিয়াছিলেন, ইহার নাম Society for the Acquisition of General Knowledge ছিল। সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনী সভার সভ্যগণ জ্ঞানান্বেষণ নামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার করিতেন। সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে পরস্পর সাহায্য করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই সভা সংস্কৃত কলেজের হলে হইত। সভায় কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইত এবং তাহার দ্বারা সভার নাম কতদূর সার্থক হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার জন্য এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তক হইতে সভার কয়েক জন বক্তার এবং বক্তৃতার বিষয়ের তালিকা দিতেছি।

K. M. Banerjea :—Reform civil and social among educated natives.

Hurro Chunder Ghose :—Topographical and statistical sketch of Bankura.

Mahes Chunder Deb :—Condition of Hindu women.

Govind Chunder Sen :—Brief outline of the History of Hindustan.

Govind Chunder Bysak :—Descriptive notices of Chittagong.

Peary Chaund Mitra :—State of Hindustan under the Hindus.

Govind Chunder Bysak :—Descriptive notices of Tipperah.

Prosonno Kumar Mitra :—The Physiology of Dessection.

এই সভার অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে রামতনু বাবু এক জন ছিলেন।

রামতনু বাবুর সহিত সকলেরই হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রামগোপাল ঘোষ স্বনামপ্রসিদ্ধ পুরুষ। রামগোপাল ঘোষ অত্যন্ত

বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বন্ধুগণ সর্ব্বদা একত্র হইতেন। বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত। পান-ভোজনও হইত। বন্ধুগণের মধ্যে কেহ দু চারি দিন না আসিলে, তিনি স্বয়ং তাঁহার বাটী গিয়া উপস্থিত হইতেন। বন্ধুগণের বিপদের সময় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতেন। তাঁহার উদারতার প্রসঙ্গে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তদীয় মৃত্যু কালে, তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা প্রাপ্য ছিল। বন্ধুগণের সাহায্য-কল্পে তিনি এত টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। তিনি যথন দেখিলেন, মৃত্যুর কাল পর্য্যন্ত সে টাকা অনাদায় রহিল, তখন বন্ধুগণকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য ঋণসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠার সম্বন্ধে শুনা যায়, তাঁহার পিতামহের শ্রাদ্ধের সময় সমাজে একটা গোলযোগ হইবার উপক্রম হইল। রাম-গোপাল ঘোষ হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী, এবং আচারভ্রষ্ট বলিয়া সমাজের নেতৃগণ তাঁহার পিতামহের শ্রাদ্ধবাসরে কেহ উপ-স্থিত হইবেন না। এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা যে কি পর্য্যন্ত ভীত এবং উৎকণ্ঠিত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি পুত্রকে কাতর ভাবে বলিলেন, "রামগোপাল, তুমি বল যে তুমি হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী নও, আচার ভ্রষ্ট নও। তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়।" রামগোপাল বলিলেন, "বাবা, আপনার আজ্ঞায় আমি সব করিতে পারি, সব কষ্ট সহিতে পারি, কিন্তু বাবা, আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।" এই

রূপ উন্নতচেতা, সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ রামতনু বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ"—ভগবানের ইচ্ছায় তাহাই হইয়াছিল।

এইরূপ সুহৃৎ-সমাজে রামতনু বাবুর কর্ম্মজীবনের প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল।

কর্ম্ম-জীবন।

কলিকাতার বাহিরে।

কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া এবং পরে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা করিয়া ১৮৪৬ সালে রামতনু বাবু কৃষ্ণনগরে কলিজিয়েট স্কুলে ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি হইল। রামতনু বাবুর বেতন এখন ১০০৲ টাকা। কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাকে কলিকাতা এবং সুহৃদ্‌গণকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে। যে সকল বন্ধুকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দিতে বড় দুঃখিত। বন্ধুগণ রামতনু বাবুর গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একটি বিদায়-সভা অহ্বান করিলেন। এই সভায় তাঁহারা রামতনু বাবুকে তাঁহাদিগের অকৃত্রিম প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ একটি সুন্দর ঘড়ি উপহার দিলেন। কলিকাতার কর্ম্ম-জীবন এই খানে শেষ হইল।

এখন রামতনু বাবু কৃষ্ণনগরে। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতি অতি সুন্দর ছিল। ছাত্রগণ অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবন এখানে এক রকম ভাল ভাবেই কাটিতেছিল। কিন্তু অধিক দিন এ ভাবে গেল না। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণনগরে ধর্ম্ম ও সমাজের পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহের বিচার চলিতেছিল। কৃষ্ণনগরের শিক্ষিত এবং ভদ্র সমাজে একটু বেশ আন্দোলন চলিয়াছিল। উন্নতিশীল যুবকগণ রণমুখী সেনার ন্যায় উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কার-প্রয়াসী। তাঁহাদের হৃদয় মন উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ। এমন সময়ে, কলিকাতা হইতে নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত, ডিরোজিওর মন্ত্রে দীক্ষিত রামতনু বাবুর আগমন তাঁহাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা রামতনু বাবুর নিকট যতটা আশা করিয়াছিলেন, ততটা পান নাই। তখনকার ব্রাহ্মেরা বেদ অভ্রান্ত বলিতেন। খ্রীষ্টানদিগকে অযথা গালি দিতেন। রামতনু বাবু ইহাদিগের সহিত এ সকল বিষয়ে একমতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহার মত অনেক উদার ছিল। তিনি তৎকাল-প্রচলিত অনেক কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন। তিনি যে একজন উন্নতিশীল, সত্যনিষ্ঠ এবং স্বাধীনচেতা

ব্যক্তি, এ কথা শত্রু মিত্র কোন পক্ষেরই আর জানিতে বাকী রহিল না।

এই সময়ে দুই একটি ঘটনা এমনই ঘটিল, যাহাতে তাঁহার কৃষ্ণনগরে বাস করা কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। বিধবা-বিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহার এই মত জানিয়া এক পক্ষের লোক রুষ্ট ছিলেন। ইঁহারা শেষে রামতনু বাবু এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু-বান্ধবকে গো-খাদক বলিয়া অপবাদ প্রচার করেন। এক দিন দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কয়েক জন বন্ধুকে লইয়া তাঁহাদের আনন্দ-বাগে বনভোজন করিতে যান। রামতনু বাবু সেই সঙ্গে ছিলেন। সেখানে একটা বড় খাসী কাটা হয়। এই সূত্রে ছিদ্রান্বেষী শত্রুরা প্রচার করেন, রামতনু বাবুরা বন-ভোজনের জন্য গোবৎস হত্যা করিয়াছেন। উন্নতিশীল দলের উপর লোকে একেই ত রুষ্ট ছিল, তাহারা এ কথা সহজেই বিশ্বাস করিল। সমাজ মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রাম-তনু বাবু এবং তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের উপর সমাজিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল। রামতনু বাবুর এক ছোট ছেলে খাট হইতে পড়িয়া মারা যায়। লোকে বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মে সহিবে কেন? গোহত্যার ফল হাতে হাতে ফলিল।" ইহার মূলে কতটা সত্য ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি! কিন্তু জন-অপবাদ মিথ্যা হইলেও অনেক সময় বড়ই ক্লেশদায়ক হয়। যাহা

হউক, রামতনু বাবু অতঃপর চেষ্টা করিয়া বৰ্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

১৮৫১ সালে রামতনু বাবু বৰ্দ্ধমান স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় গেলেন। এখানে তাঁহার বেতন ১৫০্ হইল। বৰ্দ্ধমানে তাঁহার যৌবন-সুহৃদ রসিককৃষ্ণ মল্লিক ছিলেন। তিনি তখন সেখানকার ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। রামতনু বাবু মনে করিলেন, তিনি সেখানে স্কুলে শান্তিতে থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। রসিককৃষ্ণের সঙ্গ-লাভ হইল। তাঁহার সঙ্গে সৰ্ব্বদা দেখা সাক্ষাতে, কথা বাৰ্ত্তায় যে আনন্দ, তাহা তিনি পাইলেন। কিন্তু এই সময় তিনি বিশ্বাসের বশবৰ্ত্তী হইয়া এমন একটি কাজ করিলেন, যাহার জন্য তিনি সেই আনন্দ শান্তিতে ভোগ করিতে পারিলেন না।

রামতনু বাবু এবং তাঁহার সুহৃদ্‌গণ সরলতার বড় আদর করিতেন। কপটতাকে তাঁহারা হৃদয় মনের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য কাজে কথায় এক হইবে, ইহা তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। তিনি তখন খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম না হইলেও, প্রচলিত হিন্দুধৰ্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না, এই কথা তাঁহার পরিচিত বালক বৃদ্ধ সকলেই জানিত। একদিন তাঁহার মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় একটি বালক তাঁহাকে পৈতা রাখিতে দেখিয়া অন্তরালে বিদ্রূপ করে। তিনি তাহা শুনিতে পান। এ

কথায় তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং পৈতা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে আর একটি ঘটনা হইল। ১৮৫১ সালে পূজার ছুটীতে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ রামগোপাল ঘোষের নিমন্ত্রণে তিনি এবং আর কয়েক জন বন্ধু নৌকাযোগে গাজিপুর যাইতেছিলেন। নৌকায় তাঁহারা মাঝি-মাল্লার হাতে খাইতেন। তখনও তাঁহার পৈতা ছিল। কিন্তু এরূপ বিসদৃশ আচরণ উল্লেখ করিয়া একজন বন্ধু একটু ব্যঙ্গ করেন। ইহার পর তিনি আর পৈতা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা গাজিপুর হইতে ফিরিয়া আসিলে এই পৈতা ত্যাগের কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইল। হিন্দুসমাজের লোকে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইলেন। বৰ্দ্ধমানে তাঁহার ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল। কেহই তাঁহার বাড়ী কাজ করিতে আসে না। দাস দাসী পাচক সকলেরই অভাব হইল, ইহাতে তিনি সপরিবারে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি দুঃখিত বা লজ্জিত হইলেন না। বিবেকের অনুরোধে সকল কষ্টই সহ্য করিতে লাগিলেন। এত কষ্টের মধ্যেও এক দিনের জন্য তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে শিথিলতা দেখা যায় নাই। যাহা হউক এ দিনও কাটিয়া গেল। এবার তিনি উত্তরপাড়া স্কুলে বদলী হইলেন। এখানে আসিয়াও তাঁহাকে সামাজিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল; দাস দাসীর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এ স্থান কলিকাতার নিকট

হওয়ায় তিনি অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্য পান। তাহাতে রামতনু বাবুর পরিবারবর্গের অনেক ক্লেশ লাঘব হয়। রামতনু উত্তরপাড়া স্কুলেও তাঁহার সেই প্রকৃতিগত নিষ্ঠা এবং উদ্যমের সহিত অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন। তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার শিক্ষায় তাহারা বিশেষ উপকার পাইল। এই ছাত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে অনেকে দেশে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ইঁহাদের মধ্যে একজন। উত্তরপাড়ার কৃতজ্ঞ ভক্ত ছাত্র তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া স্কুলে একখানি প্রস্তরফলক রাখিয়াছেন। ইহাতে এই কথাগুলি খোদিত আছে :—

This Tablet to the memory of
Babu Ram Tonoo Lahiri.

Is put up by his surviving Uttarpara School pupils as a token of the love, gratitude and veneration that he inspired in them, while Head Master of the Uttarpara School from 1852 to 1856, by his loving care for them, by his sound method of instruction; which aimed less at the mere impartation of knowledge than at that supreme end of all education the healthy stimulation of the intellect; the emotions and the will of the

pupil, and above all by the example of the Noble Life that he led.

রামতনু বাবু ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত উত্তরপাড়ায় ছিলেন। ইহার পরে ১৮৫৭ হইতে ১৮৬০ সালের মধ্যে তিনি যথাক্রমে বারাসত, কৃষ্ণনগর, রসাপাগলা এবং বরিশালে বদলী হয়েন। এ সকল স্থানে তাহার অবস্থান অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যাহা হউক ১৮৬১ সালে তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগরে বদলী হইলেন। কর্ম্মোপলক্ষে কৃষ্ণনগর কলেজে এই তাঁহার তৃতীয়বার আগমন। বরিশালে তিনি যে কয়মাস ছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। তথাপি তিনি যথারীতি নিষ্ঠা এবং উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ম্মে তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এখানে ৪ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া, তিনি অবসর লইবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে ১৮৬৫ সালের নবেম্বর মাসে তিনি পেন্সন লইলেন। তাঁহার পেন্সনের দরখাস্তে কলেজের অধ্যক্ষ এই মন্তব্য প্রকাশ করেন।

In parting with Baboo Ram Tanoo Lahiri I may be allowed to say, that, Government will lose the services of an educational officer than whom no officer has discharged his public duties with greater fidelity, zeal and devotion or has laboured more assiduously

and successfully for the moral elevation of his pupil.

"বাবু রামতনু লাহিড়ীর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণকালে আমি কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাহি। তাঁহার অবসর গ্রহণে গবর্ণমেণ্ট একজন সুদক্ষ শিক্ষক হারাইবেন। তাঁহার অপেক্ষা সমধিক বিশ্বস্ততা, উদ্যম, এবং তৎপরতার সহিত রাজকার্য্যে নিজকর্ত্তব্য সম্পাদন কেহ যে করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তাঁহার ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা অধিক কেহ করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না।"

আমরাও অধ্যক্ষের এই আন্তরিক প্রশংসার প্রতিধ্বনি করিয়া, রামতনু বাবু কর্ম্ম জীবনের অধ্যায় শেষ করিতেছি।

গৃহধর্ম্মে।

এ পর্য্যন্ত আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্রজীবন, এবং কর্ম্মজীবনের কথারই বেশী আলোচনা করিয়াছি। গৃহধর্ম্মে পরিবার মধ্যে, তিনি কি প্রকারে জীবনযাপন করিয়াছিলেন তাহাও জানা আবশ্যক। অন্যথা আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিব না।

ইতঃপূর্ব্বে পঠদ্দশায় তাঁহার বিবাহের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি। পরে তাঁহার হিন্দু কালেজে চাকরী হইলে, প্রসন্ন-

ক্রমে তাঁহার পিতামাতার আনন্দের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম বিবাহ হইবার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয় ইহার পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু এ বিবাহে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। শুনা যায়, লাহিড়ী মহাশয় তখন কলেজের নব্যযুবক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মতিগতি জানিয়া, তাঁহার শ্বশুর নিজ কন্যাকে কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে পাঠান নাই। এ জন্য উভয় পরিবারে বিশেষ মনোমালিন্য হয়। যাহা হউক, লাহিড়ী মহাশয়ের এ স্ত্রীও অল্পদিন পরে মারা যান। শেষে লাহিড়ী মহাশয় যখন হিন্দু কালেজে চাকরী করেন, তখন তিনি কলিকাতার সন্নিকটস্থ সাঁতরাগাছি-নিবাসী কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা গঙ্গামণি দেবীকে বিবাহ করেন। অতঃপর গৃহধর্ম্মে ইনিই লাহিড়ী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং চিরসঙ্গিনী ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম কলিকাতা আসার প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্রের পরিচয় পাইয়াছি। ইনি আলিপুরে কিছু দিন চাকরী করার পর যশোহরে জজের সেরেস্তাদার হইয়া যান। তাঁহার পদোন্নতিতে পরিবারের সকলেরই আনন্দ ও আশা বৃদ্ধি হইল। আয় বাড়িল এই-বার বাড়ী ঘর ভাল করিবেন, এই আশা কেশবচন্দ্র মনে মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না যশোহরে যাইবার, অল্পদিন পরে তিনি পীড়িত হইয়া পড়ি-

লেন। কিছুকাল রোগ ভোগ করিয়া তিনি মারা গেলেন। এই দুর্ঘটনায় লাহিড়ী পরিবারের মধ্যে ঘন শোকের ছায়া পড়িল। এখন হইতে সংসারের সমস্ত ভার লাহিড়ী মহাশয়ের উপর পড়িল। লাহিড়ী মহাশয় যথাসাধ্য সে ভার বহন করিতে লাগিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে একান্ত শোকাকুল হইলেও, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিছু দিন এইভাবে চলিল। কিন্তু আবার পরিবারে রোগ আসিয়া দেখা দিল। ১৮৪১।৪২ সালে লাহিড়ী মহাশয়ের মাতা কঠিন রোগে পীড়িত হইলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর রোগ দেখা দিল। কৃষ্ণনগরে চিকিৎসার যতদূর সাধ্য এবং সম্ভব তাহা করা হইল। কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। লাহিড়ী মহাশয় মাতাকে কলিকাতায় সুচিকিৎসার জন্য আনিলেন। কলিকাতায় সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইল না। লাহিড়ী মহাশয় স্কুলের কয় ঘণ্টা বাদে দিন রাত্রি মায়ের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। মার যখন যেটি আবশ্যক, তখনই সেটি করা হইতে লাগিল। তিনি স্বহস্তে বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। এক কথায়, লাহিড়ী মহাশয়ের অবস্থায় যতদূর সম্ভব, তাহা করা হইল। চিকিৎসক পীড়ার আরোগ্য করিতে পারেন, কিন্তু তিনি মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের মাতার মৃত্যু-

পীড়া হইয়াছিল। সাধ্বী সতী জগদ্ধাত্রী দেবী স্বামী পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ভ্রাতৃবিয়োগের শোক ভুলিতে না ভুলিতে আবার শোক পাইলেন। যাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা থাকি, যাঁহাদিগকে স্নেহ ভক্তি শ্রদ্ধা করি অথবা ভালবাসি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে যেমন তাহা শোকাকুল করে, তেমনই উহা আবার মানুষকে চিন্তাশীল করে। লাহিড়ী মহাশয় স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, চিন্তাশীল এবং ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। পরিবারের মধ্যে এই সকল মৃত্যু ঘটনায় তাঁহার চিন্তা ক্রমে ভগবানের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গুপ্ত সাধনা এই ভাবে চলিতে লাগিল। সময়ের সহিত শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস এবং তীব্রতা চলিয়া গেল। কেবল সেই মাতার স্নেহময়ী স্মৃতি মনের মধ্যে সতত জাগিয়া রহিল। লাহিড়ী মহাশয় আবার যথারীতি সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। পুরাতন যায়, নূতন আসে। ক্রমে সুকুমার কুমার-কুমারীর আগমনে তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল হইতে লাগিল। গৃহ বালক-বালিকার আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র-কন্যা হয়। ১৮৫১ সালে নবকুমারের জন্ম হয়। ১৮৫৪ সালে তাঁহার প্রথমা কন্যা লীলাবতীর জন্ম। ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা ইন্দুমতীর জন্ম হয়। ইহাদের লইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার

জীবনাকাশে আবার কালমেঘ দেখা দিল। ১৮৫৭ সালে তাঁহার পরমারাধ্য পিতৃদেবের দেহান্ত হইল। সাধ্বী গুণবতী সহধর্ম্মিণী জগদ্ধাত্রী দেবীর মৃত্যুর পর হইতে সাধু রামকৃষ্ণের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি লোকান্তরে পত্নীর সহিত মিলিবার জন্য দিন গণনা করিতেছিলেন। একে ত কেশবচন্দ্রের এবং সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতে তাঁহার মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। তাহার উপর প্রিয়তম পুত্রের উপবীত ত্যাগ এবং তাহার জন্য সামাজিক নিন্দা এবং নির্য্যাতনে তিনি আরও মর্ম্মাহত হইলেন। রামকৃষ্ণ সাধু পুরুষ ছিলেন জীবনের ভবিতব্যতায় তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং এই সকল দুঃখ তিনি ভগবানের দিকে চাহিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। শেষে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে সকল শোক-দুঃখের অতীত স্থানে লইয়া গেল। লাহিড়ী মহাশয় আবার দারুণ শোক পাইলেন। বিশ্বাসের অনুরোধে, বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি উপবীত ত্যাগ করিয়া পিতার মনে দারুণ ক্লেশ দিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি সতত দুঃখ করিতেন এবং অনেক সময়ে তিনি শিশুর ন্যায় কাঁদিতেন।

ক্রমে এই পারিবারিক দুর্ঘটনায় দিন কাটিয়া গেল। শোকের তীব্রতা কমিল। পিতৃদেবের পবিত্র পুণ্যস্মৃতি জাগ্রত রহিল।

লাহিড়ী মহাশয়ের পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহধর্ম্মে

অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে এই সময় হইতে ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কারের স্রোত খরবেগে বহিতে ছিল। পুরাতন কুসংস্কারে, সামাজিক আচার ব্যবহারে তাহার আঘাত লাগিল। সে গুলির ভিত্তিভূমি শিথিল করিতে লাগিল।

লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে, এই ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারের স্রোতের চিহ্ন ক্রমে স্পষ্টতর ভাবে দেখা যাইতে লাগিল। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বাপরই তাঁহার মত উদার ছিল। এখন তিনি স্বয়ং গৃহী, পুত্রকন্যা দ্বারা পরিবৃত। তাঁহার কন্যা দুইটির শিক্ষার ব্যবস্থাকালে তিনি আপনার মত এবং বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিলেন। তাঁহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা বিস্মিত না হইলেও, বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার পরম আরাধ্য, স্নেহশীল পিতামাতার মৃত্যুর পর হইতেই পুরাতন সমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের সম্পর্ক এক প্রকার ছিন্ন হইয়াছিল। এখন তিনি কার্য্যতঃ প্রাচীন সমাজের শাসনের বাহিরে।

হিন্দুসমাজ এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নিন্দা অথবা তাঁহাকে আচারভ্রষ্টতার জন্য নির্য্যাতন করেন না। প্রাচীন সমাজও এদিকে ক্রমে অনেকটা উদার হইতে-ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনকালে সমাজের যে অবস্থা ছিল, এখন ২০।৩০ বৎসর পরে তাঁহার পেন্সন লওয়ার

সময় সে অবস্থা, ছিল না। নানা দিক দিয়া, নানা পরি-বর্ত্তনের স্রোত আসিয়া সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। পুরাতন হিন্দু-সমাজ-সরিতে সাগরের লবণাক্ত জল মিশিয়া যাইতে লাগিল। দেশ বিদেশে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক জনের সহিত মিলা মিশায়, আলাপ পরিচয়ে, বিভিন্ন ধর্ম্মের ভাব এবং জাতির আচার ব্যবহারের প্রতি পূর্ব্বের সেই বিজাতীয় ঘৃণা ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং সমাজের ক্রমিক উদারতার চিহ্ন একটি ঘটনায় সম্প্রতি দেখিতে পাইব।

এই ঘটনাটি লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতীর বিবাহ। ১৮৬৮ সালে গভর্ণমেণ্টের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ তারাচরণ ভাদুড়ীর সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় লীলাবতীর বয়স ১৫ বৎসর। লাহিড়ী মহাশয় প্রচলিত "অষ্টমে গৌরী-দানের" ফল লাভ ইচ্ছা করেন নাই। এই বিবাহে শালগ্রামশিলা আনা হয় নাই। তিনি একমাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া তাঁহারই শুভ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া কন্যাদান করিয়াছিলেন। প্রচলিত হিন্দু রীতির অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন না হইলেও, হিন্দুসমাজের অগ্রণী সমাজপতি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ সতীশচন্দ্র সেই বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের আরও অনেক গণ্য মান্য লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে নানা প্রকারে সহায়তা

করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতেও অনেক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এইখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। লাহিড়ী মহাশয় যদিও হিন্দুসমাজের বাহিরে আসিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কৃষ্ণমোহনের ন্যায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এবং সমাজের আশ্রয় লন নাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রহ্মসমাজের অনুগত হয়েন নাই, অথবা সেই সময়ের প্রতিভাবান নব্য ব্রাহ্ম দলের নেতা কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত হয়েন নাই। তখন বিবাহ-বিষয়ক ১৮৭২ সালের তিন আইনও হয় নাই। অথচ সেই সরল বিশ্বাসী সাধু রামতনু আপনার আলোক এবং বিশ্বাস অনুসারে পারিবারিক এরূপ একটি গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আর বোধ হয়, এই সরল বিশ্বাসী পুরুষকে এই জন্যই সকলে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, এত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। লাহিড়ী মহাশয়ের পারিবারিক জীবনে এই কন্যার বিবাহ সকল প্রকারে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই বিবাহ অতি সমারোহের সহিত হইয়াছিল। পারিবারিক জীবনে, গৃহধর্ম্মে লাহিড়ী মহাশয়ের এই কয়েক বৎসর বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুখের ছিল।

ইহার পর, আবার লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে নূতন করিয়া পরীক্ষার সময় আসিল। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের

এই সময়কার স্মৃতি পুণ্য পবিত্রতার পূতগন্ধে পূর্ণ। চন্দনকে যত ঘর্ষণ করা যায়, ততই তাহার সুগন্ধ প্রকাশ পায়। বিধাতা তাঁহার ভক্তকে সংসারের শিলায় ঘর্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন ভক্তের হৃদয় কত সুন্দর।

লীলাবতীর বিবাহের পর ৭।৮ বৎসর লাহিড়ী পরিবার এক প্রকার নিরুপদ্রবে ছিলেন। অধিকন্তু, পুত্র-কন্যাগণের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের সুশিক্ষা এবং সুখের সহিত আশার আলোক আসিয়া সেই পরিবারকে আনন্দিত করিতেছিল। দুঃখের বিষয়, এ আলোক স্থায়ী হইল না। হঠাৎ তাঁহাদের ভাগ্য আকাশে কাল মেঘ দেখা দিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার দেহ মন পাত করিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে-ছিলেন। শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই। সকলেই নবকুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। একদিন সংবাদ আসিল নবকুমার সংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে। লাহিড়ী মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় গেলেন। পুত্রের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু দুরন্ত রোগের উপশম হইল না। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণনগর এবং ভাগলপুরে লইয়া যাওয়া হয়। পীড়িত অগ্রজের সেবার জন্য ইন্দুমতী স্কুল ছাড়িয়া আসি-লেন। নবকুমারের সেই দুরন্ত রোগের সেবা করিয়া ইন্দু-মতীও সেই রোগাক্রান্ত হইলেন। ইন্দুমতী দাদার জন্য

প্রাণপাত করিলেন কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। চিকিৎসা, স্থান-পরিবর্ত্তন, সেবা শুশ্রূষা কিছুতেই পীড়ার আরোগ্য হইল না। নবকুমার এবং ইন্দুমতী দুজনেই এক রোগে মারা গেলেন। ইন্দুমতী ১৮৭৭ সালে ডিসেম্বর মাসে মারা গেলেন। নবকুমার পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান। যখন পরিবারের মধ্যে, বৈশাখের সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় রোগের ছায়া অল্প অল্প অগ্রসর হইতেছিল, তখন হঠাৎ মেঘগর্জ্জন এবং বজ্রপাত হইল। সংবাদ আসিল, জামাতা তারিণীচরণ আত্মহত্যা করিয়াছেন। পরিবার মধ্যে মৃত্যুর আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হইল। ১৮৭৫ সালে এই ঘটনা ঘটিল। তিন চারি বৎসরের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের সাজান বাগান খানির কি দশা হইল! এ দৃশ্য দেখা যায় না। ইহার বিস্তৃত বর্ণনাও বড়ই কষ্টকর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার সেই বিপর্য্যস্ত ফুলবাগানের যে দু'চারিটি ফুল তখনও ছিল, তাহা দিয়াই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবতার পূজা করিয়াছেন। ভগবানকে তিনি তখনও বলিতেছেন যে, হে দয়াময় তুমি এখনও আমাদিগকে কত কৃপা করিতেছ, এখনও আমা-দের এই কয়টি পুত্রকন্যাকে আমাদের কাছে রাখিয়াছ, এখনও ইহাদিগকে ডাকিয়া লও নাই। হে প্রভু, হে দয়াময়, এতই তোমার কৃপা। আমরা যে অতি অধম, তোমার কৃপার অযোগ্য। তবুও তোমার এত করুণা। বাস্তবিক ভক্তের হৃদয় এত সুন্দর। সামান্য করুণা-কণা পাইলে ভাবে তাহা গদ্‌গদ্ হয়।

লাহিড়ী মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের পীড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিলেন। কখনও কৃষ্ণনগরে, কখনও ভাগলপুরে, কখনও আরায় থাকিয়া, শেষে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে করিলেন। আয় অল্প। পেনসনের ৭৫৲ ভরসা। কি করিয়া চলিবে, সে এক মহা চিন্তা। কিন্তু আমরা আমাদের জন্য যত ভাবি, ভগবান আমাদের জন্য তাহা অপেক্ষা বেশী ভাবেন। তিনি কি সূত্রে কাহাকে কেমন করিয়া পালন করেন, তাহা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। ভগবান ভক্তের সাহায্যের জন্য লাহিড়ী মহাশয়ের এক জন কৃতী ছাত্রকে এবং কয়েকজন মহাত্মাকে উপস্থিত করিলেন। কালীচরণ ঘোষ ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। ইনি এক সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সাংসারিক খরচ পত্রের অসচ্ছলতা জানিয়া তিনি প্রায় তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। পূজ্যপাদ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন। দেশের গৌরব ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের নানা প্রকারে উপকার করেন। কৃতজ্ঞ কৃতী ছাত্রেরও সহৃদয় গুণগ্রাহী বন্ধুগণের সাহায্যে; এবং নিজের পেন্সনের টাকায় লাহিড়ী মহাশয়ে জীবনে ভাটার স্রোত আবার কিছু দিন একটানা বহিতে লাগিল। শরৎকুমার এণ্ট্রান্স পাস করিলেন; কিন্তু সাংসারিক অবস্থার জন্য আর

বেশী পড়া হইল না। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজের কলেজে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৮৩ সালে শরৎকুমার পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি ব্যবসায়ের উন্নতি দেখিয়া আরও উন্নতি করিবার আশায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম্মত্যাগ করিলেন। ১৮৮৭ সালে শরৎকুমারের ব্যবসায়ের বেশ ভাল অবস্থা। সংসারের আর্থিক অবস্থা এখন বেশ সচ্ছল। ১৮৮৭ সালে শরৎকুমারের বিবাহ হইল। নববধূর সহিত সেই ভগ্ন পরিবারে আবার আনন্দ আসিল। মানুষ বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত। লাহিড়ী পরিবার অতীতের কথা ভুলিতে লাগিলেন। চারিদিকে যেন সুবাতাস বহিতে লাগিল। আশার আলোকে গৃহ উজ্জ্বল হইল। শরৎকুমার মনে করিলেন পিতামাতার সেবা করিয়া সুখী এবং ধন্য হইবেন। লাহিড়ী মহাশয় এবং তাঁহার গৃহিণী দুজনে জীবনের শেষ কয়টা দিন পুত্র, পুত্রবধূর সেবায় সুখে কাটাইবেন ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না। লাহিড়ী-গৃহিণী ১৮৮৯ সালে কয়েকদিনের জ্বরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

জীবনের সন্ধ্যাকালে লাহিড়ী মহাশয়ের চিরসঙ্গিনী চলিয়া গেলেন এত দিন সুখে দুঃখে যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছিলেন, আজ মৃত্যু তাঁহাকে জীবনের পরপারে লইয়া গেল। দুজনে বিচ্ছিন্ন হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় অতঃপর আবার কবে দুজনে মিলিত হইবেন, তাহার দিনগণনা করিতে লাগিলেন।

অন্তিমে।

সহধর্ম্মিণীর লোকান্তর-গমনের পর হইতে লাহিড়ী মহাশয় মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রা শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে মায়ার বন্ধন অনেকগুলি ছিন্ন হইয়াছিল। এখনও দুএকটি প্রবল বন্ধন যাহা ছিল, তাহাও মুক্ত হইতে চলিল। তাঁহার জীবনের শেষদশায় শুনিলেন, তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, হিতৈষী দীনবন্ধু, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। স্নেহাস্পদ অনুজ কালীচরণ ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। প্রিয়তম শিষ্য কালীচরণ ঘোষ, তাঁহাকে ফেলিয়া অগ্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। যাঁহাদের পবিত্র নাম এখানে উল্লেখ করা গেল, একসময় ইঁহাদের হৃদ্যতা, স্নেহ, ভক্তি লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনকে মধুময় করিয়াছিল। ইহলোকে ইঁহাদের আকর্ষণ অতিশয় প্রবল ছিল। যে সকল বন্ধনে, যে আকর্ষণে এত দিন তিনি ইহলোকে আবদ্ধ ছিলেন, একে একে সে সমস্তই প্রায় শেষ হইল। যে বন্ধন, যে আকর্ষণ রহিল, তাহা আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ক্রমে তাঁহার মহাপ্রস্থানের দিন নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব, ভক্ত অনুরক্ত জন একে একে বিদায় লইতে আসিতে লাগিলেন। এই সময় এক মহাপুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে—বিদায় লইতে আসিলেন। দুই ঋষির সাক্ষাৎ হইল। দৃষ্টিতে হৃদয়ের ভাব বিনিময় হইল। কিছুক্ষণ দুই মহাপুরুষ একত্র রহিলেন। নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন—উভয়ে উভয়ের সত্ত্বা অনুভব করিলেন। শেষে মহর্ষি বিদায় লইবার কালে বলিলেন, "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্ তুমি নানা বিঘ্ন বাধা সহ্য করিয়াও চিরজীবন ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছ; ধর্ম্মও এতকাল তোমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।" আর একটি কথা আমার মনে হইতেছে, সেটিও তোমাকে বলিতেছি। স্বর্গে দেবতারা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তুমি যাইবা মাত্র তাঁহারা তোমাকে ভগবানের কাছে লইয়া যাইবেন।

মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎকারের পর হইতে তিনি পরলোকের দিকে আরও সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন। যতই তাঁহার লোকান্তর-গমনের দিন নিকট হইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণে ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। সেই সাধু ভক্তের প্রাণে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাব আসিতে লাগিল। এখন তাঁহার হৃদয় নিভৃতে এই ভাবে প্রতিধ্বনি নয়ত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন;

"হরি বল হরি চল যাই বাড়ী
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
ফুরাল মেলা ভাঙ্গিল খেলা
আর কেন বিলম্ব বল

বিদেশে প্রবাসে ভব-পান্থ-বাসে
কিছুই আর লাগে না ভাল।
(আমার) বাড়ীপানে মন ছুটেছে এখন
মা মা ব'লে ঘরে চল।"

ভক্ত সাধু জনের জীবনের সন্ধ্যায় ইহাই স্বাভাবিক প্রার্থনা। জগজ্জননী তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তিনি তাঁহার সাধুপুত্র রামতনুকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে ডাকিয়া লইলেন। ১২৯৮ সালের ১৩ই আগষ্ট সাধু রামতনু স্বর্গারোহণ করিলেন।

বঙ্গদেশ হইতে সেই দিন একজন সাধু পুরুষ চলিয়া গেলেন। আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান্ পুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়া দেশকে এবং সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া-ছেন। কিন্তু সাধু রামতনুর ন্যায় খাঁটি লোক কয়জন জন্মিয়াছেন? তিনি কোন কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া যান নাই। তিনি চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের একটি উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সাধুতার, সরলতার এবং সত্যনিষ্ঠার আদর যত দিন থাকিবে, তত দিন এই সাধুপুরুষের পুণ্যকাহিনী লোকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত শুনিবে। তাঁহার আদর্শে, সত্যের পথে, পবিত্রতার পথে, সরলতার পথে, চলিতে চেষ্টা করিবে। সাধু রামতনুর জীবনে কর্ম্মবৈচিত্র্য বা ঘটনাবাহুল্য ছিল না। তাঁহার জীবন প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মণ্ডিত ছিল

না। কিন্তু এ সকল না থাকিলেও, তাঁহার জীবনে এমন কিছু ছিল যাহা সচরাচর সকলের জীবনে পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবন পুণ্য-জোৎস্না-পুলকিত ছিল। তিনি জীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে, প্রাণে পবিত্রতা, সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হয়। স্মৃতিতে তাঁহার আদর্শ জাগ্রত রাখিতে ইচ্ছা হয়। বাস্তবিক তিনি নরকুলে ধন্য ছিলেন। কারণ ;

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন।"

সমাপ্ত।